ঝড় ও শিশির

বিমল কর

টি. কে. ব্যানার্জী এণ্ড কোং
৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, [illegible]-১২

প্রকাশক :

শ্রীতমস বন্দ্যোপাধ্যায়,

৬এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর :

শ্রীজীবনকৃষ্ণ ঘোষ,

বেদিক প্রেস,

৫, মধুসূদন চ্যাটার্জী লেন,

কলিকাতা—২

ও

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস

১৮৭-সি, আপার সারকুলার রোড,

কলিকাতা—৪

প্রচ্ছদপট :

শ্রীসুখেন গুপ্ত

প্রথম প্রকাশ :

৩রা আশ্বিন ১৩৫৯

দাম : সাড়ে তিন টাকা

উৎসর্গ

শ্রীসারদা ভট্টাচার্য

বন্ধুবরেষু

কালবৈশাখীর ঝড় জাগিবে। তাহারই পূর্বাভাষ

আকাশের ঈশান কোণে বিক্ষিপ্ত কয়েক টুক্‌রা মেঘ অনেকক্ষণ হইতেই পড়ন্ত-বেলার রোদ গায়ে মাখিয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নীচেকার অর্ধসভ্য জনপদটির দৈনন্দিন জীবনযাত্রা লক্ষ্য করাই যেন তাহাদের উদ্দেশ্য। পাওয়ার হাউসের কালো কুচ্‌কুচে 'চিমনি'টার নিরবচ্ছিন্ন ধূম্রোদ্গার, ফাটল ধরা, আগাছা ভরতি মাঠগুলার রোদ-পোহানো কুমিরের মত ঝিম্ মারিয়া পড়িয়া থাকা উহাদের পছন্দ হয় না। সর্বাপেক্ষা দৃষ্টিকটু ঠেকে ওই পাহাড়ি ঢালু জমিটার নির্বিকার আত্মস্থিতির শাল, দেবদারু আর অশ্বত্থ গাছের বুক কাঁপাইয়া মিটার গেজ লাইনের ক্ষুদে ইঞ্জিনটা ছুটাছুটি করিতেছে—তথাপি আরণ্যক আদিমতা মাথা তোলে না। আশ্চর্য! শিকড়ের মত পল্‌কা দুটি লোহার পাত আর ছয়চাকা-ওয়ালা লৌহ শাবকটির আস্ফালন কি করিয়া যে উহারা সহ্য করিতেছে কে জানে!

নীচেরতলার এই কিম্ভূতকিমাকার বৈষ্ণব-জীবন উপরতলার পছন্দ হয় না। মেঘের দল জোট বাঁধিয়া কী যেন ষড়যন্ত্র করিতে বসে।

সূর্যাস্তের শেষ মুহূর্তে ঈশান কোণের আকাশটা হঠাৎ বড় বেশি লাল হইয়া উঠিল। অসহ্য গুমোট আবহাওয়া। সমস্ত জায়গাটা থম্‌থম্ করিতে থাকে। নভচারী শকুনির দল নীচে নামিয়া আসে। শংকিত পাখিদের পাখার শব্দে আর কর্কশ চীৎকারে আশু দুর্ঘটনার আভাস।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কী যেন ঘটিয়া যায়। ষড়যন্ত্র শেষ করিয়া কে বুঝি ইসারাও দিয়াছে।

সেই ইসারা পাইয়া নিকষ কালো মেঘের দল বন্য মহিষের মত আকাশের কোন্ এক অদৃশ্য কোণ হইতে ছুটিয়া আসে।

চোখের নিমেষে সমস্ত আকাশটার রূপ বদলাইয়া যায়। ব্লটিং পেপারের উপর কে যেন কালো কালি ঢালিয়া দিয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়ে।

ঝড় জাগে। কালবৈশাখীর ঝড়।

উপরতলায় এবার অট্টহাসির হাট; নীচের তলায় মাটির পায়ে মাথা কোটাকুটি।

ঝড় বাড়িতে থাকে।

—বাবুজী?

ঝড়ের দাপটে আর ধূলার গুঁড়ায় সুভদ্রা পথের নিশানা ভুল করিয়াছে।

বাবুজীর তাঁবুর ডাহিনে পথ। সেই পথ ধরিয়া সিকি বেলা হাঁটিলে তবে সুভদ্রাদের গ্রামে পৌছানো যায়। দুই দিন আগে সুভদ্রা নিজের গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে। চোখ খুলিয়া সামনের দিকে তাকাইবার মত সুযোগ সুভদ্রা পায় না। ধূলার ও শুকনা পাতার ঝাপ্টায় চোখ অন্ধ হইয়া আসে।

তাঁবু খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা সূর্যশংকরও করিয়াছে। অতো ছোট তাঁবু; তবু সূর্যশংকর সামলাইতে পারে নাই। ঝড়ের দাপটে আধ-খোলা তাঁবু ছিঁড়িয়া উড়িয়া কোথায় গিয়াছে কে জানে!

যাক্—উড়িয়া যাক্। যাহা যাইবার তাহা যাইবেই। মাতাল ঝড়ের এমন সর্বনাশা রূপ সূর্যশংকর বহুদিন দেখে নাই। আজ যখন সুযোগ আসিয়াছে যথোচিত মর্যাদার সহিত সে এই উন্মত্ত প্রকৃতিকে অভ্যর্থনা করিবে।

সূর্যশংকর হাতের বন্দুকটা জিপ্ গাড়ির মধ্যে নামাইয়া রাখিল। গাড়িতে উঠিয়া স্টার্ট দিতেই যন্ত্রদানবটি গর্জন করিয়া ওঠে।

সুভদ্রা কাছেই একটি পাথরের আড়ালে বসিয়াছিল। যান্ত্রিক গর্জনটা তাহার কানে যায়।

বাবুজী চলিয়া যাইতেছে? এই নির্জন, গভীর বনে, ঝড় বাদলের রাত্রে সুভদ্রা একলা পড়িয়া থাকিবে? ভীতকণ্ঠে প্রাণপণ চীৎকার করিয়া সুভদ্রা ডাকে '—বাবুজী—বাবুজী?'

সুভদ্রার চীৎকার সূর্যশংকর শুনিতে পায় না। ঝড় ও যন্ত্রের গর্জনের মাঝে নারীকণ্ঠের আর্ত মিনতি ডুবিয়া যায়।

সূর্যশংকর গাড়ির হেড্‌লাইট জ্বালাইয়া দেয়।

একটু দূরে কালো বড় পাথরটির পাশে সুভদ্রার ভীত, বিহ্বল চেহারাটা আলোর মধ্যে হঠাৎ ফুটিয়া ওঠে। সূর্যশংকর চোখ ভরিয়া দেখে। হ্যাঁ—এইবার মানাইয়াছে। অনেকক্ষণ হইল সুভদ্রা সূর্যশংকরের নিকট হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিয়াছে। তেমন কোন ঘটনা নয়। নেহাতই একটা বন্য খেয়ালের বশবর্তী হইয়া সূর্যশংকর চপল জংলী-মেয়েটার চুলের মুঠি ধরিয়া, মাথায়, মুখে, গায়ে, বুকে মদ ঢালিয়া দিয়াছে। সুভদ্রার জংলী মন কিন্তু এই ধরনের রসিকতা বরদাস্ত করিতে পারে নাই। নখক্ষত দেহটা তাহার সুরার সংস্পর্শে জ্বালা করিতেছিল। রাগ করিয়া সুভদ্রা উঠিয়া আসে। ভাবিয়াছিল, বুঝিবা বাবুজীও আসিবে। বাবুজী কিন্তু আসিল না; আসিল ঝড়। আর সে ঝড় সুভদ্রার স্বল্প ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বেশবাস তছ্‌নছ্ করিয়া দিল।

হেড্‌লাইটের আলোয় বিহ্বল, বিশৃংখল জংলী মেয়েটাকে সূর্যশংকরের আরো ভাল লাগে।

সূর্যশংকর গাড়ি হইতে নামিয়া আসে।

তক্তপোষ হইতে নামিয়া আসেন হেমন্তবাবু।

পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়সে এই ঝড়বৃষ্টি তাঁহার ভাল লাগে না। বরং ভীষণ ভয় হয়। প্রকৃতির কয়েক ঘণ্টার হঠকারিতার ফলাফল হয়তো তাঁহাকে সপ্তাহ এমন কি মাসখানেক ধরিয়াও ভুগিতে হইতে পারে। কোথায় যে কি হইবে কে জানে! লাইন ঠিক থাকে কিনা, টেলিগ্রাফের তার টিঁকিবে, না ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া তছনছ হইয়া যাইবে কে বলিবে! তেমন কিছু হইলে কাজের আর বিরাম নাই। 'টরে-টক্কা' করিতে করিতে এবং তদারক করিতে আসা ট্রলির-উপর-সমাসীন সাহেবকে সেলাম ঠুকিতে ঠুকিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া যাইবে।

এই বৃদ্ধ বয়সে স্টেসনমাষ্টারী করা আর চলে না। লোকে বলে বটে, তাঁহার আর কিই বা কাজ? এটা কি একটা স্টেসন নাকি? দ্বিতীয় লোকের প্রয়োজনই বা কেন হইবে? সকালে যে মালগাড়িটা আসে তাহারই শেষ প্রান্তে ছুইটি প্যাসেঞ্জার ট্রেণের কামরা জোড়া থাকে। সেই কামরা হইতে অল্প ক'জন যাত্রী কোনদিন নামে, কোনদিন নামে না। বৈকালে যখন কয়লা বোঝাই হইয়া মালগাড়িটা ফেরে তখন প্যাসেঞ্জার গাড়ির কামরা ছুটি আবার জুড়িয়া দেওয়া হয়। কচিৎ কদাচিত রাত্রে স্পেশ্যাল গুড্‌স্‌ ট্রেন আসে। নেহাত আশে পাশে কয়েকটা কয়লা-খাদ আছে তাই; কয়লা বোঝাইয়ের জন্য এই ছোট স্টেসনটুকু। নাম বারবুয়া। বি, এন, আর রেলের একটি ব্রাঞ্চ লাইনের একেবারে শেষ স্টেসন্।

হেমন্তবাবু তক্তপোষ হইতে নামিয়া আসিয়া টেবিলটার কাছে দাঁড়ান। কি করা যায়? এ ভাবে একা একা ভালো লাগে না। পদ্ম যে রান্নাঘরে কি করিতেছে কে জানে? টিন চাপা পড়িয়া শেষ পর্যন্ত মেয়ে আর বউটা না মারা পড়ে। পাঁচ বছরের একটা মেয়ে—তাহাকে লইয়া খাটুনির শেষ নাই। বায়না ধরিয়াছে মার কাছে যাইবে।

ছোট ছেলের বায়না, বিশেষতঃ মাতৃহীন শিশুর চোখের জল সহ্য করা কঠিন। হেমন্তবাবু নিঃসন্তান। পদ্মও দিন দিন কেমন যেন হইয়া পড়িতেছিল। এবার বড় ভাগ্নির বিবাহে গিয়া পদ্ম প্রায় জোর করিয়াই কল্যাণীকে লইয়া আসিয়াছে। কল্যাণী হেমন্তবাবুর মেজ বোনের মেয়ে। অল্প বয়সেই মাতৃহীন হইয়াছে। ঠাকুরমার কাছেই কল্যাণী মানুষ। ঠাকুরমাকেই মা বলিয়া জানে। পদ্মর আদর ও খেলনা কিনিয়া দিবার বহর দেখিয়া কল্যাণী অবশ্য পদ্মর সহিত পাড়ি জমাইয়াছিল। পাঁচ মাস মামা মামির আদর যত্নে শরীরটা তাহার ভালোও হইয়াছে। কিন্তু মেয়েটা এখানে আর থাকিতে চায় না। রোজ ঠাকুরমার জন্য বায়না ধরে। পদ্ম তাহাকে ভোলায়। হেমন্তবাবু জানেন—কল্যাণীকে আর বেশিদিন ধরিয়া রাখা সম্ভব হইবে না। তাহার ঠাকুরমাও কল্যাণীকে রাখিয়া দিয়া আসিবার জন্য তাগাদা দিতেছেন। কলিকাতা কাছে নয়, পাঁচশো মাইলেরও উপর। তাই না। নচেৎ এতোদিন কবে কল্যাণীর ঠাকুরমা লোক পাঠাইয়া নাতনীকে লইয়া যাইতেন।

কল্যাণী চলিয়া গেলে পদ্মর কি হইবে ?

হেমন্তবাবু চিন্তিত মনে এটা সেটা নাড়িতে নাড়িতে টেবিল হইতে পাজিটা তুলিয়া লন। দুই চারিটা পাতা উল্টাইতেই সেই বিজ্ঞাপনগুলি যেন তাঁহার চোখের উপর ফিস্‌ফিস্ করিয়া পরস্পরের মধ্যে কানাকানি করে।

হেমন্তবাবু অভ্যাসমত চোখ বুলাইয়া যান। তাঁহার মুখে চোখে কখন যে একটা ব্যর্থ আক্রোশ ফুটিয়া ওঠে তিনি বুঝিতে পারেন না।

অজান্তেই হেমন্তবাবুর গলায় মনের কথাটি ফুটিয়া ওঠে : জোচ্চোর

ঘরে ঢুকিয়া পদ্ম ডাকে, 'কানে কি তোমার কিছু ঢোকে না ?'

হেমন্তবাবু সচকিত হইয়া পদ্মর দিকে তাকান। পদ্ম কল্যাণীকে বিছানার উপর বসাইয়া দিয়া বলে,

—ধাক্কা দিয়ে দিয়ে লোকটা যে বাইরের দরজা ভেঙ্গে ফেলবার যোগাড় ক'রলে। শুনতে পাচ্ছো না?

হেমন্তবাবু বিস্মিত হন। এই ঝড় বাদলের দিনে কে আবার দরজায় ধাক্কা দেয়? বলেন, 'কই, কিছু শুনতে পাইনি তো? তুমি বোধ হয় ভুল শুনেছো। বাতাসে কপাট নড়ছে।'

—আমি কালা কি না? স্পষ্ট ডাক্‌তে শুনেছি। যাও না, দেখোনা একবার। দেখতে তো ক্ষতি নেই।

হেমন্তবাবু স্বীকার করিলেন, সন্দেহ যখন হইয়াছে তখন একবার দরজা খুলিয়া দেখা উচিত।

লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া হেমন্তবাবু পাশের ঘরে গেলেন সদর দেখিতে।

দরজা খুলিয়া ধরিতে সত্যসত্যই এক ধূলি-ধূসরিত ঝড়ো মূর্তি ঘরে আসিয়া ঢুকিল। সেই ঝড়ো-মূর্তির পানে তাকাইয়া হেমন্তবাবু অবাক।

দরজাটা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিয়া অমর হাঁপাইতেছে। কোথায় যেন ধাক্কা লাগিয়া তাহার কপালটা কাটিয়াছে। কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরাটা যে বাঁচিয়া গিয়াছে ইহাতেই অমর খুসি। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ধূলা ভরতি মাথাটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে অমর হাসে।

—কি মাস্টার মশাই, চিনতে পারছেন না?

প্রথমটায় চিনিয়া উঠিতে কষ্ট হইয়াছিল অবশ্য, কিন্তু এতোক্ষণে হেমন্তবাবু তাহাকে চিনিয়াছেন।

—অমরবাবু! এই ঝড় বাদলে কোথায় বেরিয়েছিলেন, মশাই?

ধূলা ঢুকিয়া চোখটা করকর করিতেছে। অমর চোখ মেলিয়া তাকাইবার চেষ্টা করিল।

—আর বলেন কেনো! সখ করতে গিয়ে প্রাণ-সংকট। বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। দু'চারটে ছবি তোলার ইচ্ছে ছিলো।

ঘুরতে ঘুরতে নদীর ধারে গিয়ে পড়ি। তারপর ঝড়। আপনার কোয়ার্টারটা না পেলে আজ অপঘাতে মরতে হতো।

হেমন্তবাবু বলেন, 'ভেতোরে আসুন। কপালটা বেশ কেটেছে দেখ্‌ছি।'

অমরকে লইয়া হেমন্তবাবু পাশের ঘরে আসেন।

পদ্ম উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। লণ্ঠনের ম্লান আলোয় অমরের দিকে তাকাইয়া পদ্মর সর্বাংগ ক্ষণেকের জন্য শিগরিয়া উঠে।

হীরাও শিহরিয়া উঠিয়াছে।

পাশের অশ্বত্থ গাছের বিরাট একটা ডাল্ মড়্‌মড়্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। ক্ষ্যাপা বাতাসের চাবুকে হীরার পুরানো টিনের চালা আর তেঁতুলকাঠের পল্‌কা কপাট আর্তনাদ করিতেছে। ঘরটা কি শেষ পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া পড়বে নাকি? হীরার ভয় হয়। তাহার সাথী ছোট মেয়েটাও বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় ঘুমাইয়াই পড়িল। একা থাকিতে হীরা ভয় পায় না। একাই জীবনের বিপজ্জনক দিনগুলি সে কাটাইতেছে। কিন্তু এই দুর্যোগ। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে বাধা দিবার শক্তি যে হীরার নাই। তাই হীরা তাহাকে ভয় করে।

—লছ্‌মি—এ লছ্‌মি ?: হীরা মেয়েটাকে ডাকে।

আশ্চর্য, লছমী কোন উত্তর দেয় না। শুইয়া শুইয়া লছমী ভাবিতেছিল গোরা সাহেবের আয়ার কথা। আয়াটা তাহাকে প্রায়ই বলে—লছমীকে সে ভালো চাকুরী জুটাইয়া দিবে। লছমী সেখানে কাজ করিলে ভালো ভালো জামা কাপড় পরিতে পাইবে। ভালো খাবার খাইবে। কাজ তেমন কিছু নয়, অর্জুন সিংয়ের কাঠগোলায় থাকিতে হইবে। রান্না করিয়া দিতে হইবে অর্জুন সিংকে। হীরার কাছে লছমী আর থাকিবে

না। হীরা তাহাকে মারে। স্টেসনের নতুন একটা কুলি আসিয়াছে। অল্প বয়স; নাম শিবলাল। শিবলালের সহিত লছমী আজ অনেকক্ষণ গল্প করিয়াছে; বিড়িও ফুঁকিয়াছে। হীরা তাহাকে বিড়ি খাইতে মানা করে না—কিন্তু শিবলালের সহিত গল্প করিতে দেখিলে চটিয়া ওঠে। আজ হীরা লছমীকে চুলের মুঠি ধরিয়া মারিয়াছে। যা তা গালাগালি করিয়াছে। লছমী হীরার কাছে আর থাকিবে না।

লছমীকে নিরুত্তর দেখিয়া হীরা ভাবে—ও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কেনই বা না ঘুমাইবে! লছমীর ভয় নাই। ভয়ের বয়স এখনো ঠিক হয় নাই।

হীরাও একদিন এমন ভাবে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাইত। তখন তাহার দিদি বাঁচিয়াছিল। বরং বলা ভালো, বুক দিয়া দিদি তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। দিনের পর দিন নূতন নূতন পুরুষকে দিদি তাহার আমন্ত্রণ করিত; তাহাদের আদর, আব্দার, অত্যাচার সবই মুখ বুজিয়া সহ্য করিত। হীরা তখন ছোট; লছমীরই মতন; বছর তেরো বয়স। আজও মাঝে মাঝে সেই সব কথা মনে পড়ে।

ঝড়, না কেউ দরজা ধাক্কা দিতেছে?

হীরা সচকিত হইয়া তাকায়। ভীষণ জোরে কে যেন দরজায় ধাক্কা মারিতেছে। এতো রাত্রে কে ডাকে?

রেড়ির তেলের ডিবাটা উজ্জ্বল করিয়া হীরা বলে—'কৌ—ন?'

উত্তর একটা আসে বৈকি। কিন্তু সে উত্তর শোনা যায় না। হীরা উঠে। যেই হোক, মানুষ তো! মানুষকে হীরা ভয় পায় না।

দরজা খুলিয়া ধরিতে যে লোকটা ঘরে ঢুকিল হীরা তাহাকে চেনে। গার্ড সাহেব। নাম পিটার। পিটার তাহার গায়ের কোটটি খুলিয়া ফেলে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলে—'হীরা-বাঈ, পানিসে সব বরবাদ্ হো গায়া।'

কোটের জল ঝাড়িয়া পিটার দড়ির উপর তাহা টাঙাইয়া দেয়। পায়ের জুতা খুলিতে খুলিতে আবার বলে—

—শালে পাইলট্ নেহি আয়া। লাইন্ তোড়া হ্যায় মালুম। ব্রেকমে হাম একেলা। খানা তো কুছ্ খিলা দে হীরাবাঈ। ভুখ শালে বহুতই জুষমণ। আঁধিকে পারওয়া—

পিটারের কথায় বাধা পড়ে। হীরা বলে,—গাড্ডি?

—মালুম গাড্ডামে; মেরা ব্রেকভ্যান ভি লাইনসে উতার গ্যয়া।

পিটার হাসে। হাসিরই কথা বটে। লাইন ভাঙ্গে ভাঙ্গুক, গাড়ি উল্টাইয়া পড়ে পড়ুক; এমন কি পাইলট্ ইঞ্জিনটা পর্যন্ত সান্টিং শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিল না ইহাতে পিটার ছাড়া কে-ই বা হাসিবে? রেলে কাজ করিয়া করিয়া পিটার এমনই হইয়াছে। রেলের ক্ষতি তাহার ভালো লাগে।

হীরা নিজের ভাঁড়ার খোঁজে।

হীরার ভাঁড়ারে অতি প্রয়োজনীয় সব কিছু পাওয়া যায়। খুব ছোট একটা মুদি, হোটেল আর পানের দোকান মিশাইয়া এক করিলে যাহা হয় হীরার ভাঁড়ার তাহাই। হীরার কাছে লোকে ছাতু কিনিতে আসে; আসে পান, বিড়ি এমন কি হাতীমার্কা সিগারেট কিনিতে। গার্ড সাহেবরা যখন গাড়ি লইয়া আসেন তখন হীরার কাছ হইতে চা, পান আনান—দরকার পড়িলে 'অর্ডার' দিয়া খাবারও তৈয়ার করাইয়া লন।

হীরা যেন এই মরুপ্রান্তরের পান্থপাদপ।

হীরার নিজের খাওয়া হয় নাই। ওবেলা রুটি সেঁকিয়াছিল। এখনো তাহা আছে। পিটার সাহেবকে খানিকটা ভাজি আর চা করিয়া দিলেই হইবে।

কিন্তু আগুন ?

সূর্য নেভে না। তাহার আগুন নিভিবার নয়।

কালবৈশাখীর সর্বনাশা ঝড়ের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সূর্যশংকরের মনটাও প্রভঞ্জনের-দোলার মত দুলিয়া উঠিয়াছে। হৃদয়-সমুদ্রের তটে তটে এক অপ্রতিরোধ্য জোয়ার আসিয়া বার বার আছড়াইয়া পড়ে। সেই জোয়ারের আশ্চর্য উন্মদনা দেহময় ছড়াইয়া যায়; শিরায় শিরায় তাহারই আবেগ, তাহারই কল্লোল।

হরিণ-গতিতে সূর্যশংকর আগাইয়া চলে। গতির নেশায় মত্ত একটা অশ্ব যেন বল্গা মুক্ত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। নিশঙ্ক, নিঃসংগ, উদ্দাম।

অর্ধ-সভ্য জনপদটির টুঁটি চাপিয়া ধরা ঝড়বৃষ্টির মুখামুখি দাঁড়াইয়া সূর্যশংকর অবশেষে একসময় থামিল।

মত্ত বিশ্বচরাচরের এ কী অপরূপ রূপ! আকাশ নক্ষত্রহীন; ঈষৎ আতাম্র। যেন রোষকষায়িত নয়নে একটা আদিম শ্বাপদ-সম্রাট নির্নিমেষ নয়নে এই সংসারটার পানে তাকাইয়া রহিয়াছে। উদরে তাহার অনাদি ক্ষুধা। লেলিহ-লোল-জিহ্ব পশুটা তাহার রুদ্রাস্ত অনুচরগুলিকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিয়া হিংস্র আনন্দে স্থির হইয়া বসিয়া আছে। পৃথিবীর বুঝি আর মুক্তি নাই। বাতাস আর বাতাস নয়, লক্ষ লক্ষ ক্রুদ্ধ নাগিনীর বিদ্যুৎগতি রথ। দ্বিধা নাই, শংকা নাই, করুণা নাই, ছোবলের পর ছোবল মারিয়া বসুন্ধরাকে তাহারা বিদীর্ণ করিবে। সূচীভেদ্য অন্ধকারে জগত সংসার লুপ্ত। মৃত্যুর মত একটা পারাপারহীন অন্ধকারের জোয়ার আসিয়া বনভূমিকেও গ্রাস করিয়াছে। রুদ্ধশ্বাস ভীতার্ত অরণ্যের প্রতি পত্রে পত্রে তাহারই মর্মান্তিক আর্তনাদ।

সূর্যশংকরও আকস্মিক একটা বেদনা অনুভব করে।

কি যেন গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদে! তাহার বড় জ্বালা, বড় বেদনা। সে জ্বালার শেষ নাই। তুষের আগুনের মত বুকের কোথায় যে একটা আগুন ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলে, জীবনের সর্বরস শুষিয়া শুষিয়া ঊষর মরুভূমির মত শুষ্ক হইয়া পড়িয়া থাকে কে জানে! সে অন্তর্জ্বালার বিরাম নাই, সে বেদনার উপশম নাই।

একটা সিগারেট ধরাইয়া সূর্যশংকর চুপচাপ বসিয়া থাকে। তাহার মনের মধ্যে বুঝি কে যেন কথা কয়।

বলেঃ সূর্য, হাতিয়ারের যুদ্ধই যুদ্ধ নয়। তোমার রক্তে, তোমার চেতনায় কোটি কোটি বৎসরের প্রাণ-পৃথিবীর একটা দুর্জ্জেয় আকর্ষণ আছে। একদিন তুমি এই প্রাণেই প্রাণ হইয়া এক হইয়াছিলে। লুপ্ত ছিলে তাহার অনু-পরমাণুর বিচিত্র লীলায়। তারপর কেমন করিয়া যেন একদিন স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছ। যে তোমাকে স্বতন্ত্র করিল—হোক্ সে লীলাময় ঈশ্বর, প্রকৃতি—যাহা তোমার মনে হোক তাহাই; কিন্তু তোমার এক পূর্ণ হইতে তোমারই আর এক ভগ্ন প্রাণকে যে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে তাহাকে তুমি ক্ষমা করিতে পারো না। এ বেদনা বুঝি সেই অসহায়ের প্রাণ কণিকার! *...Thou frail and baffled bird thou weary thing, thou strong to suffer, of snanic pride, I take the up into this height of pain—*

—বাবুজী!

সুভদ্রার আকস্মিক আর্ত-চীৎকারে সূর্যশংকর চমকাইয়া ওঠে। মনের ঝড় মিলাইয়া যায়।

সামনেই একটা বাজ পড়িয়াছে। পাওয়ারহাউসের বাতিগুলা চোখের নিমিষে নিভিয়া গেল।

জলের ঝাপ্টায় সে ভাসিয়া গিয়াছে।

সূর্যশংকর সেলফ্-স্টার্টারে পা দেয়।

অমরও সসংকোচে পা বাড়াইয়া দিয়াছে।

পদ্ম তাহার পায়ের কাটা জায়গাটা গরমজলে ধুইয়া টিন্চার আয়োডিন লাগাইয়া দেয়। সাড়ি ছেঁড়া কাপড় দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধে। মুখ তুলিয়া তাকাইতেই অমরের কপালের ক্ষতটুকুর প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়ে। আয়োডিন ভিজানো তুলার প্রাচুর্যে ক্ষতস্থান যেন আরো ফুলিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

অমর কিন্তু তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাকায়। পদ্মও তাকাইয়া রহিয়াছে। ম্লান আলোয় পদ্মর সিঁথির সিঁদুর যতোটা জ্বল জ্বল করে পদ্মর মুখটা কিন্তু ততোই ম্লান দেখায়। পদ্ম হাসে; ম্লান হাসি।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে পদ্মর দিকে তাকাইয়া অমর বলে,

—আপনার তো অনেক গুণ, বৌদি!

পদ্ম উঠে। মুখ ফিরাইয়া বলে; 'তাই নাকি! কি ভাগ্যি আমার!' একটু থামিয়া আবার, 'যাক্ তবু আপনি বললেন; এই প্রথম। কেউ তো বলে না।'

হেমন্তবাবু তক্তপোষ হইতেই বলেন, 'অমরবাবু অবশ্য তোমার হাতের প্রশংসা করেছেন। কাজে কাজেই তার মর্যাদা রাখতে তোমার একটা কিছু ভালোমন্দ রেঁধে ফেলা দরকার। রাত হয়েছে; খেয়ে নেওয়া যাক্। অমরবাবু খেয়ে-দেয়ে পাশের ঘরটাতে রাত কাটাবেন। কষ্ট অবশ্য একটু হবে।'

—আপনাদের খুব অসুবিধে করলুম।ঃ অমর সঙ্কোচ জানায়।

—অসুবিধে কিসের! ঃ হেমন্তবাবু বলেন, 'আপনি বিপদে পড়ে আমার বাড়িতে এসে উঠেছেন। দু মুঠো খাবেন আর একটা রাত শোবেন বই তো নয়! এতে অসুবিধে হবে! না মশাই, বরং এ ধরনের অসুবিধে ঘটলে আমরা খুসিই হই।

পদ্ম চলিয়া যাইতেছিল হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া বলিল,

—এভাবে খুসি করতেও আপত্তি?

পদ্মর কথায় কোথায় যেন একটা গূঢ় ইঙ্গিত ছিল আর ছিল চাপা হাসি, অমর তাহা বুঝিতে পারিল না।

হীরাও বোঝে না পিটার সাহেবের চোখে ক্রমশঃই অমন একটা লুব্ধ ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে কেনো!

হীরা তাহাকে নিজের রুটি তুলিয়া দিয়াছে। একটা মাটির সরাইয়ে খানিকটা আঁচ করিয়া ভাজি তৈয়ারী করিয়া দিয়াছে।

খাওয়া শেষ করিয়া পিটার কলাই-করা মগে চা খাইতে খাইতে হীরার আর একচোট্ তারিফ করিয়া লয়।

পিটার খাটিয়াটার উপরই শুইবার ভঙ্গিতে কাত হইয়া বসিয়াছে। আর মাত্র হাত চারেক দূরে কুলঙ্গীর সামনে হীরা বেঁকা ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসে।

—হীরাবাঈ, তোমারি মালুম হ্যায়—ম্যায় ক্রিশ্চান!

হীরা মাথা নাড়ে। বলে:

—ঝুটা বানায়া গার্ড সাহাব—তামাম চীজকো আপ্ ঝুটা কর্ দিয়া।

হীরা হাসিতেছে। সে হাসি সুন্দরী নারীর। হীরা রূপসী। শুধু

রূপসী বলিলেও হীরাকে ঠিক বোঝানো যায় না। হীরার রূপের খ্যাতি আছে এই অঞ্চলে। অনেকেই আসে রূপসী হীরাবাঈকে বেহেস্তে লইয়া যাইবার আমন্ত্রণ জানাইতে। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় হীরা সকলকে হাঁকাইয়া দেয়। অথচ হীরার সহিত প্রয়োজন প্রায় সকলেরই। এটা সেটা কিনিতে হীরার কাছে পদ্মকেও কুলি পাঠাইতে হয়। হীরা দাম লইয়া সকলের প্রয়োজন মিটায়। পানওয়ালী হীরাকে তাই ভুল বুঝিয়া অনেকে দেহের দাম দিতে আসে। হীরা কিন্তু ওই একটি জিনিসে গররাজী। হাসি, ঠাট্টা, মস্করা যা চাও হীরা প্রাণ ভরিয়া করিয়া যাইবে কিন্তু 'তাহারপর আর নয়। বাড়াবাড়ি করিলে হীরার নাকি আর একটা রূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

পিটার মগ নামাইয়া বলে :

—সিগারেট্ দো চার দে দেও, হীরা।

হীরা কৌটা হইতে সিগারেট বাহির করিয়া আগাইয়া দেয়। হাতী-মার্কা সিগারেট।

সিগারেট বাড়াইয়া দিতে আসিলে পিটার হীরার হাত ধরে। হীরা হাত ছিনাইয়া লয় না, কেবলমাত্র হাসিয়া ওঠে। সেই হাসি পিটারের হৃদ্‌পিণ্ডটাকে আরও দ্রুত করিয়া তুলে। পিটার হীরার হাত ধরিয়া কোলের কাছটিতে টানে।

—বেয়াদব্! : কৃত্রিম একটা ঝট্‌কা মারিয়া হীরা নিজেকে টানিয়া লইবার ভংগী করে কিন্তু সরিয়া আসে না। বেঁকা চোখের পাশ দিয়া কটাক্ষ হানিয়া বলে, 'গার্ড সাহাব, হাড্ডিমে আগ্ হ্যায় হামারি। ছোড় দেও।'

হীরার সে আগুনের তাপ পিটারের বুকে লাগিয়াছে বৈকি।

অনেকদিন হইতেই লাগিয়াছে। আজ যেন সেই তাপ ক্রমশঃই প্রখর হইতেছিল। এবার পিটারের শিরায় শিরায় আগুন জ্বলিয়াছে।

—বাঈ মেরি দিল,—মাই সুইট্—

পিটারের কথা শেষ হয় না, হীরা এবার নিজেকে মুক্ত করিয়া সরিয়া আসে।

পিটার তাকায়। হীরা নিজের স্থানে ফিরিয়া গিয়া তেমনি বেঁকা ভাবে দাঁড়াইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে।

পিটার তাকাইয়া থাকে। রেড়িরতেলের ডিবির আলোয় হীরা যে আরো মাতাল হইবার খোরাক যোগাইবে কে জানিত! পিটার দেখে—যুবতী নারী। হীরার রূপ তাহার চুলে, চোখে, মুখে। কিন্তু রূপ নয় রূপের আগুন; সে আগুন হীরার বেঁকা চাউনিতে, হাসিতে। পিটার মুগ্ধ অবশ নেত্রে দেখে হীরার মদির দেহের থরে থরে সে আগুনের আভা।

পিটার মনে মনে কি যেন ভাবিয়া নিজেকে সম্বরণ করিল।

সিগারেট ধরাইয়া পিটার বলে:

—রোটিকা দাম লে লেও হীরা। কেত্না লেগি বোলো?

হীরা এবার সোজা হইয়া দাঁড়ায়। বলে:

—রোটিকা দাম নেহি লাগেগি গার্ড সাহাব। পান আউর সিগরেটকো দাম দিজিয়ে।

—কাহে?

হীরা সে কথার উত্তর দেয় না। রুটির দাম সে লয়। সব কিছুরই দাম। কিন্তু অন্য সময়ে হীরা ব্যবসা করে। আজ এই ঝড় বাদলের দিনে একটা পরিচিত লোক আসিয়াছিল। হীরা নিজের মুখের অন্ন

তুলিয়া দিয়াছে। এ যেন স্বতন্ত্র একটা ব্যাপার; ইহার জন্য দাম লইতে হীরার গরজ নাই, ইচ্ছাও নাই।

পিটার শেষ কথাটা শুনিতে পায় না। মন তখন তাহার অন্যচিন্তায় মগ্ন। দাম না লওয়ার কথায় পিটার রীতিমত বিস্মিত হয়! ভাবে, পানওয়ালী হীরার হঠাৎ এ খেয়াল কেন! তবে কি হীরাবাঈ আজ সদয় হইয়া উঠিল! অল্পক্ষণ পূর্বের ব্যাপারটা নেহাতই একটা ছলনা! পিটার মনে মনে কি যেন ভাবে। খাটিয়া হইতে নামিয়া আগাইয়া যায়। দড়ির উপর কোট্টা ঝোলানো রহিয়াছে। কোটের পকেটে পিটারের টাকা আছে।

টাকা সূর্যশংকরের পকেটেও আছে। তাই বলিয়া সুভদ্রার হাতে টাকা গুঁজিয়া দিয়া সূর্যশংকর একলা বাড়িতে আসিয়া উঠিবে তেমন স্বভাব তাহার নয়।

সূর্যশংকর বাড়ির সামনে জিপ্ দাঁড় করাইয়া নামিয়া পড়িল। দোনলা বন্দুকটা তুলিয়া লইয়া সুভদ্রাকে ডাকিল, 'আযা—'

সুভদ্রার নামিতে কি কারণে বিলম্ব হইতেছিল। সূর্যশংকর অন্ধকারেই হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। তাহারপর যেন এক টান্ মারিয়াই সুভদ্রাকে পায়ের কাছে টানিয়া আনিয়া দাঁড় করাইল। তাহার ওই বাঘের মত থাবার পেষণে সুভদ্রা শুধু একটা অস্ফুট যন্ত্রণার রেশ তুলিয়া থামিয়া গেল।

জোরে বৃষ্টি পড়িতেছে।

সুভদ্রার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সূর্যশংকর বারান্দায় উঠিয়া

আসিল। সমস্ত দরজাগুলি বন্ধ। মধ্যকার ঘরে আলো জ্বলিতেছে। খানিকটা আলো দরজার খড়খড়ির উপর হামাগুড়ি দিতেছে।

সূর্যশংকর দরজায় ধাক্কা দেয়।

কোনো সাড়া শব্দ নাই। বারান্দা হইতে সূর্যশংকর দেখে প্রলয় তখনও থামে নাই। বরং আরো বুঝি বাড়িয়াছে। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমকে সামনের অরণ্যের পাগল করা মূর্তিটা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কানে বাজিতেছে অবিশ্রান্ত জলধারার শব্দ আর ক্ষুব্ধ প্রকৃতির গর্জন।

সূর্যশংকর এবার বুটের ঠোক্করে দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করে।

ভিতরের লোক বুঝিতে পারে দরজায় কে যেন প্রবল জোরে ধাক্কা দিতেছে।

সার্সি খুলিয়া দরজাটা অর্ধেক মেলিয়া ধরিতেই সূর্যশংকর সুভদ্রাকে টান মারিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। যে দরজা খুলিয়াছে তাহাকে একটা ধমক দিবার জন্য মুখ তুলিতেই তাহার চোখ অপর একজোড়া চোখের উপর আটকাইয়া যায়। মুখের কথা মুখেই থাকে।

নিষ্পলক নয়নে শ্বেতবাস নারী মূর্তিটির পানে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে সূর্যশংকরের মুখে বিস্ময় ও অপ্রত্যাশিত আনন্দের ছায়া ভাসিয়া ওঠে। তাহার মনে হয় সে স্বপ্ন দেখিতেছে না তো !...অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিতে পারা যায়, স্বপ্ন নয়; সূর্যশংকর যাহাকে দেখিতেছে সে রক্তে-মাংসে গড়া বনলতা। বনলতাও বিস্মিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার বিস্ময় বেদনার ম্লান প্রকাশের মধ্যে চাপা পড়িয়াছে।

বিস্ময়াহত, রুদ্ধবাক সূর্যশংকর নিজেকে ফিরিয়া পায়।

—বনলতা ?

সূর্যশংকরের গলার স্বরের পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

সমস্ত ঘটনাটা বুঝিয়া লইতে বনলতার বিলম্ব হয় নাই। হইবার কথাও নয়। সূর্যশংকরের জীবন যাত্রার খুঁটিনাটি সংবাদ দীর্ঘদিন ধরিয়া সে সংগ্রহ করিয়াছে। এই ধরনের দৃষ্টিকটু দৃশ্য যে তাহাকে নিজের চোখে দেখিতে হইবে এতোটা হয়তো সে কল্পনা করে নাই।

বনলতা মুখে কিছু বলিল না কেবলমাত্র প্রশ্নসূচক দৃষ্টি মেলিয়া সূর্যশংকরের পার্শ্ববর্তী সংগীনির প্রতি তাকাইয়া রহিল।

সূর্যশংকর যাহাকে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বাড়িতে আনিয়া তুলিয়াছে তাহাকে এতোক্ষণে আলোয় স্পষ্ট ভাবে দেখা গেল। বনলতার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সেও সংগীনির পানে তাকায়। সিক্তবাস, অর্ধনগ্ন, জংলী মেয়েটার রূপ না থাক যৌবন আছে। আর সে যৌবন অত্যন্ত প্রখর ভাবেই বনলতার চোখকে বিঁধিতেছিল। সুভদ্রা জংলী হইলেও জানোয়ার নহে। ঘরের মধ্যে বনলতাকে সে সহ্য করিতে পারে না; এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করিয়া খোলা দরজা দিয়া ছুটিয়া পালায়।

সূর্যশংকর শুধু একবার ফিরিয়া তাকায়।

হাতের বন্দুকটা চেয়ারের গায়ে ঠেস দিয়া রাখিতে রাখিতে সূর্যশংকর বলে:

—হঠাৎ? কি মনে করে?

বনলতা সে কথার উত্তর দিতে বিলম্ব করে। সব কিছু সহিয়া লইবার জন্য খানিকটা সময় দরকার।

ব্রিচেস খুলিয়া চাকরকে হাঁক পাড়ে সূর্যশংকর। তারপর বনলতার দিকে তাকাইয়া বলে:

—কলকাতা থেকে একলা এলে নাকি?

—না। অমরের সংগে এসেছি।

—অমর ? কোথায় সে ?

—জানি না। বিকেলে ক্যামেরা ঝুলিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে, এখন পর্যন্ত ফেরে নি।

সূর্যশংকর চেয়ারে বসিয়া সিগারেট ধরায়।

—কবে এসেছো ?

—আজ তিন দিন। এসে শুনলাম সেদিন সকালেই তুমি শিকার করতে বেরিয়েছো !

—হ্যাঁ। একটা বাঘের খবর পেয়েছিলাম। ঃ এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া সূর্যশংকর হাসে।

বনলতা সোজাসুজি তাহার দিকে তাকাইয়া এবার বেঁকা সুরে কথা কয় ঃ

—দেখলাম তো স্বচক্ষে।

—কি ?

—বাঘ জোটেনি কিন্তু বাঘিনী জুটেছে।

সূর্যশংকর কথাটা মনোযোগ দিয়ে শোনে, তারপর দরাজ গলায় হাসিয়া ওঠে। বলে ঃ

—ঠিক বলেছো।

বনলতাকে তাহার মিহি কালো-পেড়ে থান শাড়িটায় ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হইতেছে। চুপচাপ কিছুক্ষণ কাটে। অবশেষে বনলতাই বলে ঃ

—আমি সব ছেড়ে-ছুড়ে তোমার কাছে এসেছি।

সূর্যশংকর এতোক্ষণে সত্যিই অবাক হয়।

—মানে ?

—মানে আর কী। সংসার, বাড়ি, সমাজ, সম্মান সব ছেড়েই

এসেছি।

সূর্যশংকর উঠিয়া দাঁড়ায়।

বনলতার বেদনা তাহার কণ্ঠস্বরে উপচাইয়া উঠিয়াছে। আর কিছু শুনিবার দরকার নাই তাহার।

খানিকটা পায়চারী করিয়া সূর্যশংকর বলে:

—আসা উচিত হয়নি।

বনলতা কথাটা শুধু কানেই শোনে না শব্দটা যেন কোনো এক যাদুমন্ত্র-বলে ঘরের বাতিটাকে নিভাইয়া দিয়া তাহাকে এক অন্ধকার গুহায় ছুঁড়িয়া দেয়।

সে কি যেন বলিতে চায় কিন্তু সূর্যশংকর তাহার সামনে নাই। কোথায় সূর্যশংকর? বনলতা ভাবে: সে তো ছল করিয়া তাহাকে ধরিতে আসে নাই। তবে—?

পিটার কিন্তু ছল করিয়া হীরাকে ধরিতে গিয়াছিল।

দড়ির উপর মেলিয়া দেওয়া জলে-ভেজা কোটটা আনিতে আগাইয়া গিয়া পিটার আচমকা পাশ ফিরিয়া হীরাকে বাহুবদ্ধ করিয়া ফেলে। হীরা পিটারের ছল না বুঝিলেও তাহার নিবিড় আলিঙ্গনকে বিফল করিতে বিলম্ব করিল না।

হীরার দাঁতের ছোবল খাইয়া সামান্য একটু পিছু হটিতেই সমস্ত দৃশ্যপটটা একেবারে বদলাইয়া যায়।

কুলঙ্গি হইতে চোখের পলকে সাদা হাড় বাঁধানো ছোট ভোজালিখানি তুলিয়া লইয়া হীরা তাহার নগ্ন নিটোল বাহু বঙ্কিম রেখায় মেলিয়া ধরে। পিটার বোঝে—তাহার বুকের সমান্তরালে যে ধারালো, বেঁকানো পদার্থটা সাপের ফণার মত হিংস্র ভঙ্গীতে স্থির হইয়া আছে তাহা বিপজ্জনক।

হীরার দেহটাও যেন খোলা তলোয়ারের মত জ্বলিতেছে।

ধাক্কা খাইয়াই যেন পিটার বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়। তাহার মুখের ওপর হীরার দরজা বন্ধ হইয়া যায় সশব্দে। বৃষ্টির জলে পিটারের চমক ভাঙ্গে।

শীত করিতেছে। দমকা হাওয়ায় নিঃশ্বাস আটকাইয়া আসে। পিটার দরজায় করাঘাত করিয়া ডাকে : হীরা, হীরাবাঈ।

ডাকিতে ডাকিতে একসময় পিটারের গলা ভাঙ্গে—সার্ট, প্যাণ্টালুন ভিজিয়া বেজায় ভারী হইয়া ওঠে।

অমরের চোখের পাতা ভারী হইয়া আসিলেও ঘুম আসে না। কপালের ব্যথাটা আস্তে আস্তে ছড়াইয়া গিয়াছে। সমস্ত মাথা ভার মনে হয়—টন্ টন্ করে।

পায়ের অবস্থাও সেই প্রকার। পদ্মর হাতে বাঁধা ব্যাণ্ডেজে যন্ত্রণার কিছুটা লাঘব হইয়াছিল—কিন্তু তাহা ক্ষণিক—এখন পা-টা যেনো আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছে।

শারীরিক যন্ত্রণাকে ছাপাইয়া রহিয়াছে আর এক যন্ত্রণা। সে যন্ত্রণা দুশ্চিন্তা। বনলতার জন্য অমরের দুর্ভাবনার শেষ নাই। আজিকার এই ভয়ংকর দুর্যোগের রাত্রে বনলতা কি করিতেছে, কে জানে? জঙ্গল-ঘেরা তেপান্তরের জন-মানবহীন বাড়িটায় বনলতা একা। আর আছে সূর্যশংকরের নেপালী চাকর বাহাদুর। বাহাদুর বিশ্বাসী এবং বলবান। হঠাৎ কোন একটা বিপদ ঘটিলে বাহাদুর অবশ্য প্রাণপণে বাধা দিবে। কিন্তু ধরা বাঁধা পথ ধরিয়াই কি সব সময় বিপদ আসিয়া দেখা দেয়? অপ্রত্যাশিত, অভাবনীয় রূপেও ইহা আসে বৈকি!

আজ যেমন আসিয়াছে।

অমর বিছানায় উঠিয়া বসে—। বালিশের তলা হইতে সিগারেটের প্যাকেটটা টনিয়া লইয়া অন্ধকারেই একটা সিগারেট ধরায়।

বাহাদুরের মুখটা অমরের চোখে ভাসিয়া উঠিতেছে। ক্ষুদ্রাস্থিপুষ্ট চ্যাপ্টা মুখ। দেখিলে নির্বোধ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু বাহাদুরের চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটা শয়তানি হাসি। ক্ষুদে ক্ষুদে, গোলাকার ভ্রূ-হীন সেই চোখ দুটি জনমানবহীন পুরীর মতই রহস্যময়। মনে পড়ে, অমরের সহিত বনলতাকে দেখিয়া বাহাদুর অবাক হয় নাই, বোকার মতন কেবল হাসিয়াছিল।

কে জানে বনলতার ভাগ্যে কি আছে? বাহাদুর যদি নিজেই কোন একটা বিপদ ঘটাইয়া বসে বনলতা কি নিস্তার পাইবে?

সিগারেটে শেষ একটা টান দিয়া অমর বিছানায় শুইয়া পড়ে। আজ আর তাহার চোখে ঘুম আসিবে না। দুর্ভাবনায় দুর্যোগের প্রতিটি প্রহর দুঃসহ হইয়া উঠিতেছে।

দুঃসহ হইয়া উঠিতেছে এই দানতা।

দাও-দাও করিয়া হাত পাতিয়া চাহিতে সুধাকর বাকি রাখে নাই। ভিক্ষুকের মত যতো বেশি আবেদন জানাইয়াছে কুসুম ততোই ভয় পাইয়া সরিয়া গিয়াছে।

সুধাকর ভাবিয়া পায় না—কুসুম কেনো ভয় পায়—? তাহাদের ধর্মে এমন কোনো অনুশাসন নাই—যাহাতে কুসুমের দেহ-ভোগ দিতে বাধা থাকিতে পারে।

কুসুম বলে

—গোঁসাইয়ের মানা।

সুধাকর চটিয়া ওঠে।

—বলি মানাটা কিসের ? আমি কি তোর সোয়ামী নই ?

কুসুম ভালো করিয়াই জানে সুধাকর তাহার স্বামী। তথাপি এ স্বামীর সহিত তাহার মনের প্রার্থিত পুরুষটির মিল নাই। গোঁসাই বলেন—কুসুমের মনের মধ্যে যে পুরুষটি ঘর বাঁধিয়াছেন তিনি চিরকালের পুরুষ—কৃষ্ণ।

কুসুম প্রায়ই ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কৃষ্ণের স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে শ্যাম আসেন। তিনি যে মেঘবরণ এ কথা লক্ষ লক্ষ বার কুসুম শুনিয়াছে কিন্তু স্বপ্নের শ্যামকে গৌরবরণ বলিয়াই কুসুমের মনে হয়। আর সেই গৌরবরণ শ্যামের হাতে বাঁশি নাই। বদনে, অংগে কোথাও চন্দনের তিলক স্পর্শ করে নাই। তাঁহার কণ্ঠে মালা আছে—তবে সে মালা ফুলের নয়—সাপের। নীলকণ্ঠ মহাদেবের ছবি কুসুম দেখিয়াছে। ঠিক তেমনি। কুসুমের শ্যামের গলায় বেড় দিয়া একটা সাপ নিশ্চিন্তে ঘুমায়।

কুসুম ভয় পায় না। কিন্তু কাঁদে। তাহার ভীষণ অভিমান হয়। মনে মনে বলে : ঠাকুর, তোমার এরূপ কেনো !

গোঁসাইজী বলেন :

—অভিমান করিস নি, কুসুম। অভিমান পাপ। গোবিন্দ দয়া করেছেন তোকে। তাঁর ধর্ম তিনি পালন করেছেন আর তুই ক'রবি অভিমান ! পাগল মেয়ে, শোন, একটা তুলসীদাসের দোঁহা শোন্—

দয়া ধরম্‌কি মূল হৈঁয়,
নরক মূল্‌ অভিমান্‌।
তুলসী মৎ ছোড়িয়ে দয়া,
যঁও কণ্ঠাগত জান॥

গোঁসাই তাঁর অনুপম কণ্ঠস্বরে দোঁহা গেয়ে ওঠেন। তারপর কুসুমকে বোঝান দোঁহার ভাবার্থ: ধর্মের মূল দয়া আর নরকের মূল অভিমান! রামভক্ত তুলসীদাস তাই নিজেকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে তুলসি, তোমার দেহে যতদিন প্রাণ আছে তুমি দয়া ক'রতে দ্বিধা ক'রবে না।

গোঁসাইয়ের কথায় কুসুমের চোখের জল আরও বাড়ে। মনে মনে বলে: গোঁসাই, অমন কথা ব'লো না, সকলকে কি দয়া করা যায়, না ক'রতে আছে!

সুধাকরও স্থির করিয়াছে—সে আর হাত পাতিয়া ভিক্ষা চাহিবে না। বয়লারের মত তাহার কামনার বিরাট চুল্লিটা এবার খুলিয়া ধরিবে। সেই দুরন্ত তাপে কুসুম যদি পুড়িয়াও যায় ক্ষতি নাই। সুধাকর ওসব ধর্ম-টর্ম বোঝে না—তাহার স্বামীত্ব যদি কুসুম সরাসরি স্বীকার করিয়া না লয়—সুধাকর এবার শক্তি প্রয়োগ করিবে।

কুসুম ঘুমাইতেছিল। অল্প আলোয় কুসুমের ঘুমন্ত চেহারাটা নজর করিয়া সুধাকর সোজা হইয়া উঠিয়া বসে। কুসুম কালো। কিন্তু কালো হইলে কি হইবে কুসুমের ছলছলে কচি মুখটায় কিসের যেনো স্বাদ লাগিয়া আছে। ডাগর, টানা চোখ। পুরু ওষ্ঠে স্নিগ্ধ একটা হাসি। ঘুমন্ত কুসুমের বুকের বাস সরিয়াছে। সাড়ির আঁচলটা পায়ের উপর অনেকটা গুটাইয়া গিয়াছে।

বিছানার ওপর উঠিয়া বসিয়া সুধাকর রুদ্ধনিঃশ্বাসে তাহাই দেখে। নগ্ন নিটোল বাহু দিয়া কুসুম বালিশের একটা প্রান্ত আঁকড়াইয়া স্বপ্নে কাহাকে যেনো আকর্ষণ করিয়াছে। ঘুমন্ত কুসুম অজ্ঞাতসারে আকর্ষণ করিয়াছে সুধাকরকেও। সুধাকর চোরের মত নিঃশব্দে উঠিয়া বসে—পা টিপিয়া আগাইয়া যায়। আলনায় টাঙানো সায়া, গামছা কোনটা

লইবে ভাবিতে থাকে। এক সময় কুসুমের বৃন্দাবনী ছাপানো সাড়িটাই টানিয়া লইয়া সরিয়া আসে। বাতিটা নিভাইয়া দিবে নাকি? অন্ধকারে যদি মুখ বাঁধিতে অসুবিধা হয়!

সুধাকর ভাবিয়া দেখে—বাতি নিভাইয়া দিলেও অন্ধকারে কুসুম তাহাকে ঠিক চিনিবে। চিনুক—ক্ষতি নাই! আজিকার রাত্রের মত সুধাকর নিজেকে গোপন রাখিতে চায় না।

সুধাকর বিছানার ওপর নিঃশব্দে উঠিয়া আসে। কে যেন জানালায় ধাক্কা দিতেছে। ধাক্কা নয়—বাতাস। বাহিরে প্রকৃতি প্রগলভা হইয়াছে। তাহারই জের।

কুসুম স্বপ্ন দেখিতেছিল: ঝড়জলের রাত, ত্রস্ত পাদক্ষেপে সে যেন কোথায় চলিয়াছে। পথ অন্ধকার, বিদ্যুৎ-সচকিত প্রান্তর; কাঁটায় বস্ত্রাঞ্চল আটকাইয়া যায়—চরণ ক্ষত-বিক্ষত। এতো বাধা, এতো বেদনা—তবু কী যে আনন্দ!

কুসুমের বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া কে যেন আকর্ষণ করে! কে—? শ্যাম? কুসুম শিহরিয়া ওঠে। সলাজ-শংকায় সর্বাংগ অসাড়। ঘুম ভাঙিয়াও ভাঙে না। নিসাড়া হইয়া তাঁহার স্পর্শ লইতে কুসুমের বাধে না।

সে স্পর্শ ঘন ও উত্তপ্ত হইলে কুসুম চোখ মেলিয়া তাকায়। আলোয় আসিয়া কুসুমের চেতনাটা হঠাৎ বুঝি জাগিয়া ওঠে। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেই সুধাকর খাট হইতে নীচে গড়াইয়া পড়ে।

কুসুম বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বিশৃঙ্খল বেশবাস দুই হাতে আঁকড়াইয়া হাঁপাইতে থাকে। বিহ্বল, রুদ্ধবাক্ সে মূর্তির দৃষ্টিতে স্বপ্নভঙ্গের সজল বিস্ময়। উনানের আঁচে তাহার দেহটাও যেন ঝলসাইয়া গিয়াছে। সর্বাংগে অসহ্য দহন-জ্বালা।

হীরাবাঈয়ের মনেও জ্বালা ধরিয়াছে। ঝড়ের সহিত এই পুরুষ-মানুষগুলির লালসারই বা তফাৎ কি! হীরা খাটিয়ার উপর শুইয়া শুইয়া ভাবে। একটা সর্বনাশ করিতে পারিলেই তো তাহারা সুখী। নিজের স্বার্থ লইয়াই তাহাদের সব। দিদির কাছে যাহারা প্রতিরাত্রে আসিত হীরা তাহাদের দেখিয়াছে। কুত্তাগুলা লালসায় লাল হইয়া দিদির দরজায় ধর্ণা দিত। কয়েকটা টাকা ছুঁড়িয়া দিয়া—বিনা বাক্য ব্যয়ে দিদিকে ছোঁ মারিয়া টানিয়া লইয়া যাইত পাশের কুঠরীটায়। তাহার পর সেই উন্মত্ত পশুগুলার পাশবিক পেষণে দিদির মিনতি, মানা, বাধা সব চাপা পড়িয়া যাইত।

দিদি যতদিন রঙ্ মাখিয়া পাশের কুঠরীর দরজা খোলা রাখিয়াছিল ততদিন সকলেই আসিয়াছে। অথচ সেই দিদিই যখন দুরারোগ্য কুশ্রী ব্যাধিতে বিকৃত দর্শন, পংগু, যন্ত্রণা-জর্জরিত হইয়া মরিতে বসিল তখন একদিনের জন্যও কাহাকেও দেখা গেলো না। মরিবার সময় একজন মাত্র আসিয়াছিল। হীরা তাহাকে চিনিয়া রাখিয়াছে। প্রৌঢ় ইব্রাহিম মিয়া। ইব্রাহিম মিয়া ও অঞ্চলের নামকরা ওস্তাদ। তারসানাই আর তবলায় তাহার জুড়ি খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। ইব্রাহিম মিয়া হীরার দিদিকে দেখিয়া পাথরের মত স্তব্ধ হইয়া দীর্ঘক্ষণ বসিয়াছিল মাত্র। একটাও কথা বলে নাই। যাইবার সময় কে জানে কেনো—হীরাকে আলাদা ভাবে ডাকিয়া আনিয়া বলিয়াছিল—ঃ "বেটি, বিল্লি বোলে তো লাট্টা, আউর পিয়ার করো তো খাট্টা; সুরাৎ সমঝো আসলি ঝুট্টা—দুনিয়া···

অর্থঃ মা, বেড়াল ডাকলে তাকে লাঠি দিয়ে মারবে—, আর ভালো যদি কাউকে বাসো তোমায় কঠিন হতে হবে। রূপ হচ্ছে পৃথিবীতে সবার বড় মিথ্যে···

ইব্রাহিম মিয়া ঠিকই বলিয়াছিল। হীরা আরও কঠিন হইবে। পুরুষমানুষদের সে যেটুকু বিশ্বাস করিত আজ হইতে তাহা আর করিবে না। ঝড়জলের রাতে যাহাকে আশ্রয় দিয়া, নিজের অন্ন দিয়া হীরা অভুক্ত রহিল সেই মানুষটাই শয়তানি করিয়া তাহাকে ধরিতে আসিয়াছিল? বেইমান—!

রাগে, ক্ষোভে দুঃখে হীরাবাঈয়ের চোখে জল আসে।

বনলতার চোখেও জল আসিয়াছিল। অতি কষ্টে নিজেকে সংবরণ করিয়া বনলতা বলে:

—আমার কথা না হয় নাই ভাবলে। কিন্তু তোমার নিজের কথা?

সূর্যশংকর নিভিয়া আসা পাইপে ঠাস করিয়া তামাক পুরিতে পুরিতে বনলতার দিকে তাকায়।

—নিজের জন্যে আমার ভাবনা নেই তোমায় কে বললে?

বনলতা এ কথার কি উত্তর দিবে বুঝিয়া পায় না! তাহার চোখের সামনে ইজিচেয়ারে যে ছন্নছাড়া মানুষটি বসিয়া রহিয়াছে তাহার সহিত তর্ক করা চলে না। কারণ তর্কের যুক্তি দিয়া যাহাকে বোঝানো চলে সে মানুষ সূর্যশংকর নয়। বুদ্ধির গিঁট বাঁধা সহজ সড়ক ধরিয়া সূর্যশংকর হাঁটে না—তাহার প্রকৃতিও যেমন বন্য, চলার পথটাও তেমনি মনের গরজে শৃংখল-শূন্য।

সূর্যশংকর হাতের পাইপ হইতে তীব্র কটু ধোঁয়ার বাঁকা রেখা উঠিয়া তাহার মুখের পাশে খেলা করিতেছে। বনলতা অর্থশূন্য দৃষ্টিতে তাকাইয়া তাকাইয়া তাহাই দেখে। সূর্যশংকরের তামাটে মুখটা বনলতার কাছে দূর আকাশের তারার মতই দূরান্তরের আলো বলিয়া মনে হয়।

সূর্যশংকর হঠাৎ কথা বলে—

—অনেক রাত হলো শুতে যাবে না ?

সূর্যশংকরের কথায় বনলতার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়।

—যাই।

বনলতা মুখে বলে 'যাই' কিন্তু যায় না। বসিয়া বসিয়া ভাবে সূর্যশংকরকে কি করিয়া নিজের মনের কথা বুঝাইবে। সূর্যশংকরও এ ভাবে বনলতার দৃষ্টির সামনে বসিয়া থাকিতে থাকিতে সম্ভবতঃ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। একটা হাই তুলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া সূর্যশংকর উঠিয়া দাঁড়ায়। পাশের দেওয়ালে একটা সদ্য শুখনা ভাল্লুকের চামড়া ঝোলানো ছিল সূর্যশংকর তাহাই পরখ করিয়া দেখিতে থাকে।

অবশেষে বনলতা উঠিয়া দাঁড়ায়।

—আমি ফিরে গেলে সত্যিই তুমি খুসি হবে।

প্রশ্নটা আচমকা। সূর্যশংকর মুখ ফিরাইয়া তাকায়।

বনলতা পত্রচ্যুত দীর্ঘ-তরু দেবদারুর মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

সূর্যশংকর আগাইয়া আসে। সম্ভবতঃ তাহার অনুকম্পা জাগিয়াছে। বলে,

—আমায় খুসি করার জন্য তোমার আত্মবঞ্চনার ঘটা দেখে নিজের ওপরই অসম্ভব রাগ হচ্ছে।

আত্মবঞ্চনা ? বনলতার বিস্ময়ের মাত্রা হারায়। কঠিন আঘাত পাইলে মানুষ যেমন জ্বালাধরা ক্ষেদোক্তি করিয়া থাকে বনলতা ঠিক তেমন সুরেই বলে :

—আত্মবঞ্চনা তুমি কাকে বলো ? যদি ভাবো সংসারের ওপর আমার লোভ আছে আজো। অথচো সব ছেড়ে ছুড়ে তোমার কাছে এসেছি জীবনপাত করে প্রমাণ করতে, তোমায় আমি আজো

ভালোবাসি! আর একেই যদি তুমি আত্মবঞ্চনা বলো আমি মুখ বুজেই থাকবো।

ভাবাবেগে বনলতার গলা কাঁপিতে থাকে। তাহার সুশ্রী মুখের রেখাগুলি কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

সূর্যশংকর শব্দ করিয়া হাসে না কিন্তু তাহার পুরু ঠোঁটের পাশে আশ্চর্য একটা হাসি ফুটিয়া ওঠে।

—ছেড়ে দিয়ে আসাটাই বড় কথা নয়—। ছেড়ে দেবার গোড়ার কথাটা বাস্তব। সুভদ্রাকে ছাড়ার ইচ্ছে আমার ছিলো না। তোমার উপস্থিতিতেই বাধ্য হলাম ছাড়তে। অন্তরে আমার যাই থাক তোমার আবির্ভাবে সভ্য সমাজের রুচির তাগিদটাই এখানে বড় হয়ে দেখা দিলো।

—তাই যদি বলো : বনলতা আরো স্পষ্ট ও সহজ হইয়াছে, 'তাই যদি বলো, নিজের তাগিদেই আমি এসেছি। আমার তাগিদ তুমি।

—কিন্তু আমি তো তোমায় ডাকিনি, বনো!

সূর্যশংকর এই প্রথম বনলতাকে অতীত দিনের সেই একান্ত করিয়া ডাকা নাম ধরিয়া ডাকিল। বনলতার কানে এ ডাক এড়াইয়া যাইবার নয়। ক্ষণেকের জন্য বনলতার অনুভূতি কী যেন একটার স্বাদ পাইয়া শিহরিয়া ওঠে।

বনলতা চুপ করিয়া থাকে।

বহুদিনের সঞ্চিত একটি বর্ণ-বহুল মুহূর্ত সুযোগ বুঝিয়া মনসমুদ্রে ডুবুরী হইয়াছে।

বনলতার আকস্মিক ভাবান্তর যে ভাবপ্রবণতার অলীক ঐশ্বর্য সূর্যশংকর অবশ্য তাহা বুঝিতে পারে। স্মৃতি-মন্থনের বিলাসিতায়

যে গরবিনী তাহাকেও কিন্তু দিবাস্বপ্নে বিভোর থাকিতে দিতে তাহার ইচ্ছা হয় না।

বনলতার ভাবলেশহীন করুণ মুখের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া সূর্যশংকরের মনে হয়—বেঁফাস সম্বোধনটা না করিলেই হইত। ইহাতে আর কিছু হোক্ আর না হোক্ বনলতা হয়তো সূর্যশংকরের দুর্বলতাটুকুর সুযোগ লইতে ছাড়িবে না। সূর্যশংকর একান্ত ভাবেই তাহা চাহে না। বরং বনলতাকে আরও রূঢ়, আরও নির্দয়ভাবে আঘাত করিতে পারিলেই ভালো হয়।

—কি হলো চুপ, করে গেলে যে—? ঃ সূর্যশংকর অগত্যা কথা বলে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বনলতা জবাব দেয়,

—কি বলবো।

—বলার কিছু নেই। তা ভালো। এবার তা হলে তুমি শুতে যাও। অনেক রাত হয়েছে।

আকাশের কোলে কোলে মেঘ করিয়া আসার সুনিশ্চিত সম্ভাবনা হঠাৎ সূর্যালোকের তীব্রতায় নিষ্ঠুর ভাবে নষ্ট হইয়া গেলে যেমন একটা থাপছাড়া অবস্থার সৃষ্টি হয় বনলতার মনের অবস্থাও তাহাই হইল। দীর্ঘ দাহন সহ্য করিবার পর হঠাৎ কোথা হইতে যেন বৃষ্টির ভিজা গন্ধ আসিয়া তাহার মনটাকে সবে মাত্র মেদুর করিতেছিলো অকস্মাৎ সমস্ত দৃশ্যটা একেবারে বদলাইয়া গেলো। বিরক্ত হইয়া বনলতা বলে—

—আমাকে শুতে পাঠানোর জন্য তোমার এতো তাগিদ কেনো ?

—তাগিদ ? ও হ্যাঁ—তাগিদই বলতে পারো। তাগিদটা অবশ্য আমার নিজের গরজে। আমি খুব টায়ার্ড। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

কথা শেষ করিয়া সূর্যশংকর বড় রকম একটা হাই তুলিয়া শেষে হাসে। হাসিটা অনেকটা বিনয় করিয়া বেত মারার মত। অন্তত

বনলতার তাই মনে হয়। তাহার হঠাৎ আরও মনে হয়—সূর্যশংকরের ব্যবহারে কোথাও আন্তরিকতা নাই। একটু আনন্দ, আশা, খুসি—; না কিছুই না। উপরন্তু বনলতা নিজের গরজে আসিয়াছে বলিয়া সূর্যশংকর অনাহুতকে নির্বিকল্প উপেক্ষা করিতেও বাকি রাখে নাই। ভাবিতে ভাবিতে বনলতার মনটা ক্রমশই যেনো সূর্যশংকরের উপর বিরূপ হইয়া উঠিতে থাকে। বিশেষতঃ এই যে অপমান, এ অপমান বনলতার সহ্য হয় না। বলে :

—আমার কাছে দুদণ্ড বসে থাকতে তোমার ঘুম পায়—কিন্তু আর কোথাও দিনের পর দিন রাতের পর রাত জেগে থাকলেও তোমার ঘুম পেতো না।

—কে বললে ?

—বলবে আবার কে , আমি জানি।

—ঠিক জানো না। তা হলে—

—থাক্। দরকার নেই আমার ওসব কথা শুনে। : বনলতা সূর্যশংকরের কথায় বাধা দেয়। একটু নীরব থাকিয়া উষ্ণকণ্ঠে বলে, 'তোমার সঙ্গে আমার কথাটা আজই সেরে নিতে চাই। একটু অপেক্ষা করবে ?'

—বেশ। বলো !

—আমি কেন এসেছি তা কি তুমি জানো না ?

—না। আমি যখন তোমায় আসতে বলিনি তখন কেনো তুমি এসেছো আমার পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়।

—তা হলে আমিই বলি। আমি এসেছি তোমার কাছে থাকতে। তোমার সাথে ঘর গড়বো বলে।

বনলতা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে সোজাসুজি তাহার মনের কথাটা

প্রকাশ করিয়া ফেলে। সূর্যশংকর নীরবে কি যেনো একটু ভাবিয়া লয়—তারপর বলে :

—আমার সংগে তোমার থাকার অবলম্বন কি হবে ?

—যা হওয়া উচিত ; অনেক আগেই যা হতো।

—অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী ?

বনলতা নীরব থাকে। সূর্যশংকর বলে :

—না, তা হয় না।

—হয় না। কেন ?

—খুব সহজ কারণে। তোমায় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার আগ্রহ আমার নেই।

কথাটা অত্যন্ত রূঢ় ভাবে বনলতার কাণে আসিয়া বিঁধিল। এতোটা সে স্বপ্নেও আশংকা করিতে পারে নাই। নিথর, নির্বাক বনলতা শুধু মাত্র তাকাইয়া তাকাইয়া সূর্যশংকরের ভাবলেশহীন মুখখানা দেখিতে থাকে। মনে মনে কি ভাবে কে জানে—হয়তো কিছুই ভাবিবার মতন তাহার অবস্থাও নয়, তথাপি বনলতার ঠোঁটের আগায় অস্পষ্ট জড়িত একটা শব্দ বাহির হইয়া আসিয়াই আবার সেই মুহূর্তেই মিলাইয়া যায়।

অল্প কয়েকটি মুহূর্ত। একটু পরে সূর্যশংকর বিনা বাক্যব্যয়ে ঘরের বাহিরে বারান্দা দিয়া অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। আর বনলতার সর্বাংগ কেমন একটা রুদ্ধ আবেগে কাঁপিয়া উঠিতেই সে সামনের চেয়ারটায় বসিয়া পড়ে। সামনের দেওয়ালে টাঙ্গানো ভল্লুকের কালো চামড়াটা হঠাৎ যেনো বনলতার চোখের পর্দাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কিছুই আর সে ভাবিতে পারে না, দেখিতেও পায় না।

চোখের পলকে কোথা হইতে যেন একটা বোবা আবেগের স্রোত আসিয়া তাহার সমস্ত অনুভূতিটুকুই গ্রাস করে।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে অমরের অনুভূতিও কে যেন হরণ করিয়াছে। কে? অমর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া আগন্তুকের হাত চাপিয়া ধরে।

অন্ধকারে কাহাকেও দেখা না গেলেও অমর যাহার হাত ধরিয়াছে সে যে স্ত্রীলোক তাহা বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। আগন্তুকের হাতের চুড়ি অমরের মুঠিতে বিঁধিয়াছে। ভীত ও বিহ্বল কণ্ঠে অমর প্রশ্ন করে, 'কে—'?

চুরি করিতে আসিয়া ধরা পড়িলে চোরের অবস্থাটা যেমন ভীতি-বিহ্বল, কিং-কর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়ে পদ্মর অবস্থাও তাহাই হইল। হাত ছাড়াইয়া অন্ধকারে গা ঢাকা দিবার স্বাভাবিক একটা চেষ্টাও যে না করিল, এমন নয়। ব্যর্থ হইয়া অবশেষে সে যেন মরিয়া হইয়া ওঠে।

—ভয় পেলেন?

অমর সত্যসত্যই ভয় পাইয়াছে। ভয় পাইয়াছে এই অন্ধকার আর—ওই অদৃশ্য মূর্তিকে।

—আমি পদ্ম। হাত ছাড়ুন।: চাপা সুরে কথা বলে পদ্ম। অমরের হাত হইতে নিজের ধৃতকর মুক্ত করিয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়ে।

অমরের বুকের মধ্যে কে যেন আরো জোরে হাতুড়ি পিটিতে থাকে। সরিয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া ও বলে' আপনি—!'

অন্ধকারে পদ্ম বুঝি বা হাসিয়া ওঠে। বলে,

—আমিই তো। ভূত নয়, মানুষ।

—এত রাত্রে ? : অমরের একটু সাহস হইয়াছে এতোক্ষণে।

—আসতে নেই ?

অমর কোন উত্তর দেয় না। বিছানার আর একপ্রান্তে সরিয়া যায়।

বিছানার উপর ভালো হইয়া বসিয়া পদ্ম গা এলাইয়া দেয়। বলে, —চুরি করে দেখতে এসেছিলাম পাটা কেমন আছে ? খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, না—?

—খুব নয় ; সামান্য, একটু আর কি। এর জন্য আপনি এতো ব্যস্ত হলেন কেনো ? : অমর ক্রমশই কেমন যেনো বিমূঢ় হইয়া পড়িতেছে। ব্যাপারটা তাহার ভালো লাগে না।

পদ্ম বলে :

—আপনি বড় ভীতু !

অমর চুপ করিয়া থাকে। তাহার সর্বাংগ অসাড় হইয়া আসিবার উপক্রম করিয়াছে। অমর উঠিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেই পদ্ম তাহার হাতখানা জোর করিয়া চাপিয়া ধরে।

—এতো ভয় !

—আপনি কি চান ? : মরিয়া হইয়া শেষ পর্যন্ত অমর কথাটা বলিয়া ফেলে।

তাহার কথায় পদ্ম এবার হাসে। মৃদু, ক্ষীণ হাসি।

—কি আর চাইবো ? : হাসিতে হাসিতে পদ্ম বলে। আর তারপর অমরের হাতে হাত মিশাইয়া রাখে।

সমস্ত শরীরটা অমরের নিমেষে শিহরিয়া উঠিয়াছে। মাথার মধ্যে কোথায় যেন বিদ্যুতের শিহরণ। সমস্ত চোখ মুখ গরম। নিজেকে জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া অমর উঠিয়া পড়ে। সে রীতিমত হাঁপাইতেছে। হাঁপাইতে হাঁপাইতেই বলে,

—আপনি যান। ছি, ছি—!

—কিসের ছি, ছি? : পদ্মও উঠিয়া বসিয়াছে।

—হঠাৎ যদি ঘুম ভেঙ্গে মাষ্টারমশাই এখানে আসেন কি ভাববেন বলুন তো?

পদ্ম আবার বিছানায় শুইয়া পড়ে। তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে,

—ও! এই! আমি ভাবলুম না জানি আর কি? তা উঠে পড়লেন কেনো, বসুন না? ভয় হচ্ছে? : পদ্ম মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসে।

অমর এবার যথেষ্ট সাহস ও শক্তি অর্জন করিয়াছে। রূঢ় কণ্ঠেই উত্তর দেয়,

—ভয়ের কথা নয়। ভাবনার কথা। আপনার পাশে আমার এভাবে বসা কি ভাল দেখায়?

—খারাপই বা কি দেখাবে! অন্তত হীরাবাঈয়ের পাশে শোওয়ার চেয়ে আমার পাশে বসা অনেক ভালো। তা ছাড়া হীরা আপনাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো আর আমি—: পদ্ম কাথাটা শেষ না করিয়া থামিয়া যায়

পদ্মর কথায় অমরের বুকের ঘড়িটা আবার দ্রুত ও সরব হইয়া ওঠে। নিমেষে অতীতের একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া যায়। মাত্র চার পাঁচ মাস আগে সে যখন এখানে কিছুদিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়াছিল তখন বাস্তবিক এমনই একটা কাণ্ড ঘটে। হীরাকে দেখিয়া অমরের লোভ জাগিয়াছিল। এই বন্য জায়গায় অমন একটা নারীদেহকে উপভোগ করার মধ্যে কোনপ্রকার বাধা জুটিতে পারে অমর ভাবে নাই। সহুরে কায়দায় পয়সা ফেলিয়া অমর তাহাকে শয্যাসংগী করিতে গিয়াছিল। দুঃখের বিষয় হীরা কলিকাতার ফিটফাট বাবুটিকে দরজার বাহির করিয়া দিতে তিলমাত্র বিলম্ব করে নাই। যাহাই হউক,

এই গোপন তথ্যটুকু পদ্ম কি করিয়া জানিতে পারিল? আর শুধু জানা নয়—এ জানার সহিত পদ্ম নিশ্চয় অমরের চরিত্রের গোপন দুর্বলতাটুকুও জানিয়া ফেলিয়াছে। তাই পদ্মর এত সাহস। অমর কিছুক্ষণ আর কথা বলিতে পারে না। শেষে কোনরকমে বলে,

—হীরা আর আপনি কি এক?

—দুই-ই বা কেনো?

—ছি, কি ব'লছেন! হীরা ছোটলোক। তার না আছে সংসার, না সমাজ। আর আপনি—

—ভদ্রলোক; ঘরের বৌ। স্বামী আছে, সংসার আছে; না—! : পদ্ম উঠিয়া বসিয়াছে।

—তাইতো, তাছাড়া আপনার মেয়ে আছে।

পদ্ম হঠাৎ অমরের একটা হাত খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলে। রুদ্ধ কণ্ঠে বলে,

—কে ব'লেছে আপনাকে আমার মেয়ে আছে?

অবাক হইয়া অমর উত্তর দেয়,

—কেনো, ওই মেয়েটি!

—আমার নয়। আপনাদের মাষ্টারমশাইয়ের ভাগ্নী। কিছু-দিনের জন্যে ওকে এনে দিয়ে আপনাদের মাষ্টারমশাই আমায় কৃতার্থ ক'রেছেন—!

পদ্মের কথার সুরে তীব্র অভিমান, বিক্ষোভ ও বেদনা। অমর তাহা বুঝিতে পারিয়া চুপ করিয়া যায়।

পদ্মও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিতে থাকে,

—আমি খুব বেহায়া নয়! : দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া একটু পরে আবার সে বলে, 'আমার বলে কিছু নেই। কিছু না। আমার এ সংসার সাজানো

বাসনের মতন! বাইরে থেকেই যতো শোভা। ভেতরটা চিড় ধরে নষ্ট হয়ে গেছে। কাউকে সে কথা বুঝিয়ে বলার মত নয়। কতোবার ভেবেছি গলায় দড়ি দিয়ে মরি। শেষ পর্যন্ত তাও পারি না। মরতে আমার ভয় করে।

পদ্মর কথার সুরে যতোটা না ধার, তাহার অপেক্ষা ঢের বেশি অস্পষ্টতা।

অমরের জীবনে এমন অভিজ্ঞতা এই প্রথম। বেচারা ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। পদ্ম যে কি বলিতেছে তাহা অমরের পক্ষে চট্ করিয়া বুঝিয়া ওঠা মুস্কিল। তথাপি এটুকু অমর বোঝে—পদ্মকে ঠিক যেভাবে প্রথমটায় সে সন্দেহ করিয়াছিল—সেভাবে সন্দেহ করা চলে না।

পদ্ম উঠিয়া বসিয়াছিল। অমর তাহার আবেগক্ষুব্ধ ঘন নিঃশ্বাস পতনের স্পর্শ পাইতেছে। হঠাৎ কি মনে করিয়া অমর অন্ধকারে পদ্মর একটি হাত ধরিয়া বলিয়া বসে,

—আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, বৌদি। তবু বলি, ভুল বুঝে মনে আঘাত দিয়ে থাকলে আমায় ক্ষমা করুন!

—ক্ষমা উল্টে আমারই বুঝি চাওয়া দরকার। : পদ্ম অমরের হাত নিজের হাতে টানিয়া লয়।

অমরের বিহ্বল ভাবটা কাটিয়া গিয়াছে। তাহার সারা শরীরে কিছুটা উষ্ণতা।

—আমার হয়তো প্রশ্ন করা উচিত নয়। তবু এ নিতান্ত কৌতুহল ছাড়াও আরো কিছু। আপনি কি মাষ্টারমশাইকে নিয়ে সুখী হন নি? : অমরের গলার স্বর অন্তরঙ্গ।

—কে হয়?

—অবাক করলেন। কে না হয়? মেয়েরা—বিশেষ করে

আমাদের সমাজের মেয়েরা স্বামী পেলেই তো সুখী। : অমর মুখে যখন কথাটা বলে তখন মনে মনে বনলতার কথা ভাবে। বনলতাও স্বামী লইয়া সুখী হয় নাই। বিধবা হইয়াও নয়। অবশ্য এ সবের কারণ সূর্যশংকর। কিন্তু পদ্ম—? তাহার জীবনেও কি বনলতার মত একটি করুণ পরিচ্ছেদ আছে!

—স্বামী পেলে আমরা সুখী হই বই কি! কিন্তু শুধু মন্তর পড়লেই কি স্বামী হওয়া যায়?

—মানে—?

—ও, মানেটা বুঝি জানেন না—বোঝেন না, না—? : পদ্মর কণ্ঠস্বর আবার তীক্ষ্ণ হয়।

—না।

পাশের ঘর হইতে হঠাৎ কে যেন কাঁদিয়া উঠিয়াছে। ঘুমের ঘোরে যে কাঁদিতেছে পদ্ম ও অমর দুজনাই তাহাকে চিনিতে পারে। মাষ্টারমশাইয়ের ভাগ্নী। কান্না শুনিয়া পদ্ম ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসে। অন্ধকারেই পা বাড়াইয়া দেয়। বলে,

—অমনি করে কেউ যদি আমার জন্যে কাঁদতো—!

কথা শেষ হয় না, পদ্ম অন্ধকারেই মিলাইয়া যায়।

অমরের সর্বাংগে অসহ্য জ্বালা ধরাইয়া দিয়া পদ্ম বিদায় লইয়াছে। চোখে তাহার ঘুম নাই। অন্ধকারে তাকাইয়া তাকাইয়া অমর ভাবে, আশ্চর্য এই নারী!

কালবৈশাখীর দুর্দ্ধর্ষ ঝড়ও থামে। মনের ঝড় থামে না।

আকস্মিক ভাবেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসিয়া হানা দিয়াছিল, যতোটা পারিয়াছে নিজের ক্ষমতাটা জাহির করিয়া বিদায় লইয়াছে। ক্ষতি কিছু কম করে নাই। লাইন ভাঙ্গিয়া, তার ছিঁড়িয়া, একাকার করিয়াছে। শাল, দেবদারু, অশ্বত্থের গর্বহানি ঘটাইতেও তাহাকে বেগ পাইতে হয় নাই। কিন্তু যাহা করিবার এক নিঃশ্বাসে সারিয়া ফেলিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গিয়াছে। নবতর ক্ষতি সাধনের হুমকি দিতে আসর জাঁকিয়া বসিয়া থাকে নাই।

ভোরের আলোয় আর একটি নূতন দিনের সূচনা হয়। সূচনার সূত্র বহিয়া আসে মধ্যাহ্ন। বৈকালের পথ ধরিয়া আর একটি সন্ধ্যা।

এমনি করিয়াই রৌদ্রসিক্ত মুহূর্তগুলির হাত ধরিয়া দিন আসে, বন্ধ্যা-সন্ধ্যার পাখায় ভর করিয়া সে দিনও উড়িয়া যায়। কৃষ্ণপক্ষের নিঃসংগ ভারু চাঁদ মাঝরাতে মৌরিবনের মাথায় ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া আবার আত্মগোপন করে।

আকাশের ঝড় কবে থামিয়া গিয়াছে; মনের ঝড় তবু থামে না। অরণ্য আকুলিত দীর্ঘ রাত্রির মতই সে ঝড়ের উপস্থিতি মানুষগুলিকে আরো চাপিয়া ধরে।

শ্বেত-ধূসর মেঘগুলির পানে তাকাইয়া তাকাইয়া বনলতা ভাবে। বেতের চেয়ারে গা এলাইয়া চোখ বন্ধ করিয়া অমরও চুপচাপ পড়িয়া থাকে।

একদিন একসময় কি ভাবিয়া আপন মনেই হাসিয়া ওঠে অমর।

অমরের হাসিতে বনলতার ধ্যান ভাঙ্গে।

—কি হলো ?

—কিচ্ছু না। হাসি পেলো।

—হঠাৎ !

—হঠাতই। আমাদের সবই তো হঠাৎ। ঠিকঠাক করে, ঝাকজোক কষে কটা জিনিসই বা জীবনে ঘটে। : অমর নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসে। বলে, 'একটা কথা কি জানো বনো-দি, আমরা মনের মতো ঘটনা ঘটাবার চেষ্টা করি, কিন্তু শতকরা একটা ঘটনাও ঘটাতে পারি না। যদি পারতাম পৃথিবীতে দুঃখ বলে কিছু থাকতো না।'

অমরের দার্শনিকতায় বনলতা বিস্মিত হয় না। ছেলেটা ওই ধরনের। ছবি আঁকিয়া, ফটো তুলিয়া, গান গাহিয়া দিন কাটায়। এর তার ফাইফরমাস খাটে। সাধ্যমত পরোপকার করে। প্রয়োজন হইলে হাত পাতিয়া টাকা ধার করে। আবার পকেটে টাকা থাকিলে অক্লেশে দান করিয়া বসে। অমরের জীবনটা নোঙরবিহীন নৌকার মত। হাওয়ায় ভাসিয়া চলিয়াছে, নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য নাই। অমর বলে, জীবনে যাহারা উদ্দেশ্যের পিছুপিছু ধাওয়া করে তাহারা আর যাহাই হউক, ভদ্র-মানুষ নহে। অবশ্য এখানে ভদ্র-মানুষ বলিতে অমর বোঝে নির্ঝঞ্ঝাট ভালো মানুষ। স্বার্থসিদ্ধির জন্য যাহারা পাশা খেলিতে নারাজ। অমরের কথাবার্তায় বনলতা কৌতুক বোধ করে। অযথা তর্ক করিয়া তাহাকে ক্ষেপাইয়া দেয়।

অমরের কথায় আজ কিন্তু বনলতা কৌতুক বোধ করিতে পারে না। বরং, অমরের কথায় কোথায় যেন একটা সত্য রহিয়াছে বলিয়াই তাহার মনে হয়।

—তুমি কি কোনো ঘটনা ঘটাবার চেষ্টা করেছো। : বনলতা মৃদু হাসিয়া আলাপরত হয়।

—আমি ! না, আমি নিজে কিছু করি নি। কয়ার প্রয়োজন

অনুভব করি নি কোনোকালে।

—তবে ?

—দেখেছি কি না, তাই। এই ধরো না তোমার কথা—

—আমার কথা ! আমি আবার কি ঘটাবার চেষ্টা করলাম !

—করলে না ! কতোই তো করলে। আজীবন সে চেষ্টাই করছো। সূর্যদা'কে নিয়ে সুখের ঘর গড়তে চেয়েছিলে, কিন্তু যেদিন সন্দেহ হলো সূর্যদা' চোরাবালি, তাকে করলে বাতিল। পরবর্তী অধ্যায়ে এলেন সুকুমারদা'। তাঁর সংসারে প্রতিষ্ঠা পেলেও প্রাণ পেলে না। পাত্র পরিবর্তনের আসল উদ্দেশ্যটাই তোমার বিফলে গেলো। সুখই বলো আর সার্থকতাই বলো, নিজের সত্তাকে সংকীর্ণ করে এদের পাওয়া যায় না। সুকুমারদা'ও বিদায় নিলেন। দেখলাম তোমার বৈধব্য। কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন। ভেবেছিলে নীতির নাগাল ধরলে স্বর্গলাভ হবে, শুচিতায় শান্তি জুটবে। তোমার কপালে তাও জুটলো না, বনো-দি'। স্বামীর সংসার সহজলভ্য—দুর্লভ কিন্তু স্বামীত্ব। সুকুমারদা' তোমায় সংসার দিয়েছিলেন, স্বামীত্বের স্বাদ কিন্তু পেয়েছিলে সূর্যদা'র কাছে। তোমায় আবার তাই ফিরতে হলো। এলে এখানে। এসে কি দেখলে, কি পেলে, বনো-দি'—? : অমর প্রশ্নসূচক টান দিয়া কথার মাঝপথেই থামিয়া যায়। একটু পরে দেহটাকে পিছন দিকে এলাইয়া দিয়া আপন মনেই বলে, 'ভাগ্যে তোমার কিছুই জুটলো না। বরং দুঃখের বোঝাটা ভারি হলো আরও। তাইতো বলি বনো-দি', বার বার সুখের আশায় কতো কি তো ঘটাবার চেষ্টা করলে—কিন্তু পারলে কই !' অমরের গলার সুরে সহানুভূতির বেদনা।

বনলতা চট করিয়া অমরের কথার কোনো উত্তর দিতে পারে না। কি উত্তরই বা দিবে। তাহার জীবনের চরম কথাটা অমর যতোটা

বুঝিয়াছে এতোটা আর কেহ বোঝে নাই, বুঝিতে পারে নাই। অমর ঠিকই বলিয়াছে। নিজের জীবন লইয়া বনলতা জুয়া খেলিতে বসে নাই। আঁকজোক কষিয়া মনোমত সামাজিক ইমারত গড়িতে গিয়াছে; পারে নাই। ব্যর্থতায় তাহার দুঃখের বোঝাটাই কেবল দিন দিন ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

—এখন কি করবে? : অমর আচমকা প্রশ্ন করে।

—কিছু বললে আমায়? : আত্মস্থ বনলতা অমরের কথা শুনিতে পায় নাই।

—বলছিলাম, এবার কি করবে?

—তাই ভাবছি। কি করবো বলতে পারো—?

—ইচ্ছে করলে অবশ্য তুমি এখানে আরো কিছুদিন থেকে আকাশ-পাতাল ভাবতে পারো, কেউ বাধা দেবে না। সূর্যদা' তোমায় তাড়িয়ে দিতে পারবে না ঠিকই, কিন্তু এভাবে থাকা কি ভালো, বনো-দি'? অহোরাত্র নিজেকে পীড়ন করে লাভ নেই। বরং চলো, আমরা ফিরে যাই—

—ফিরে যাবার কথা আমি ভাবতে পারি না।

—কেনো?

—কোথায় ফিরে যাবো? শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যেতে বলো!

—গেলেই বা। সুকুমারদার মা তোমায় স্নেহ করেন। তাড়িয়ে দেবেন না নিশ্চয়।

—আদর করে ঘরে তুলেও নেবেন না। তাঁর বিধবা পুত্রবধূ অনাত্মীয় একটি যুবকের সঙ্গে সকলের অজ্ঞাতে ঘর ছেড়ে চলে এসেছে। তাঁদের ধারণায় আমি কুলে কালি দিয়ে কলঙ্কিনী হয়েছি। এ অবস্থায় আমায় ঘরে তুলে নেওয়া যায় না।

—ও সব কথা আমি জানি, বনো-দি'। নতুন করে শোনার কিছু নেই। কিন্তু একটা কথা আমার মনে হয়। বাড়ি ছেড়ে আসার ব্যাপারটা তুমি যতোটা বড় করে দেখছো, এতোটা বড় করে দেখার কিছু নেই এতে। অন্তত এখানে। সুকুমারদা'র মাকে আমি ভালো করেই চিনি। তুমি যদি ফিরে যাও, আর তোমার মধ্যে ছলনা না থাকে, মাসিমা তোমায় কখনোই বিমুখ করবেন না।

—মা হয়তো বিমুখ করলেন না, কিন্তু সকলেই তো মা নয়, অমর। আমাদের অন্যান্য আত্মীয়স্বজন আছে। তারা টিট্‌কিরি দিতে ছাড়বে কেনো!

—আত্মীয়স্বজন বলতে তো তোমার দেবরটি। তা দেবরটির ভার আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারো। আমার বন্ধুকে তোমার চেয়ে আমি বেশি চিনি।

—আর কেউ নেই বুঝি?

—আবার কে—?

—সম্পর্কীয় আত্মীয়রা।

—তাদের কথা ভেবো না।

—তাদের কথারই ধার বেশি কি না, তাই দামও বেশি।

—কেনো?

—তারাই সমাজ—তাদের মতই নীতি, সংস্কার। মা আমায় ঘরে তুলে নিতে পারেন, ওরা কিন্তু আমায় সমাজে তুলে নেবে না।

—না নিক্। তুমি তোমার আসন ছাড়বে না।

—আমি ছাড়তে না চাইলেই কি আর আঁকড়ে ধরে রাখতে পারি! পারি না। তুমি এতো বোঝো আর এ কথাটা বোঝো না! একের সম্মতি ও সুখকে সমাজ প্রশ্রয় দেয় না।

বনলতার কথায় অমরের আবার আগের মতই হঠাৎ হাসি পায়। সশব্দে হাসিয়া উঠিয়া অমর বলে,

—আশ্চর্য, বনো-দি'! সমাজ বোঝো, নীতিজ্ঞানও তোমার টনটনে দেখছি; তবু কোন্ সাহসে বাড়ি ছেড়ে চলে এলে তা বুঝতে পারলুম না।

—সাহস করে তো আসি নি, ভাই। মনে মনে বিশ্বাস ছিল আমার সম্বল আছে, তাই এসেছিলুম।

বনলতার গলার স্বরে অমরের মুখের হাসি মুছিয়া আসে। একদৃষ্টে ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে তাকাইয়া অমর বলে,

—এবার তো বুঝলে তুমি নিঃসম্বল। এখন অন্তত সাহস করে ফিরে চলো।

—না।

—না—! : অমর বনলতারই কথার প্রতিধ্বনি করে।

—না, যেখান থেকে চোরের মত পালিয়ে এসেছি সেখানে আবার ফিরে যেতে পারবো না। : বনলতার কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

—ফিরে যাবে না, করবে কি? থাকবে কোথায়?

—এখানে নয়। অন্য কোথাও। ব্যবস্থা একটা করতে হবে। যে কদিন ব্যবস্থা করতে না পারি তুমি আমার সংগে থেকো। তারপর যেখানে খুসি চলে যেও।

—আমি কিন্তু বেশিদিন এখানে থাকতে পারবো না।

—কেনো?

—ইচ্ছে নেই।

—ইচ্ছে নেই? : বনলতা অতো দুঃখেও হাসিয়া ফেলে। সূর্যশংকরের

সহিত অমরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাটা তার ভালো করিয়াই জানা আছে। বছরের মধ্যে নিদেনপক্ষে দু'মাস অমরের এখানেই কাটে। এখানে একবার আসিলে আর ফিরিবার নাম করে না। তাই হঠাৎ অমরের মুখে বিপরীত সংকল্প শুনিয়া বনলতা না হাসিয়া পারে না। বলে, 'ভূতের মুখে রাম নাম শুনছি—!'

—তা ঠিক। আমার কিন্তু সত্যি সত্যি থাকার ইচ্ছে নেই।

—আমার জন্যে নাকি?

—সবটা তোমার জন্যে নয়, তবে খানিকটা তো নিশ্চয়।

বনলতার মুখের হাসি মিলাইয়াও মিলায় না। গোধূলির শেষ আলোটুকুর মতই তাহা ম্লান একটা মাধুর্য লইয়া ফুটিয়া থাকে।

অমর ভাবপ্রবণ, স্নেহধন্য। বনলতাকে সে যতোটা ভালোবাসে সূর্যশংকরকে তাহা অপেক্ষা কম নয়। বরং, আরো বেশি। সূর্যশংকর ও বনলতাকে কেন্দ্র করিয়া অমর মধুর ভবিষ্যতের স্বপ্ন আঁকিয়াছিল। সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন যে বনলতার নিঃস্ব রূপটা অমরকে অহোরাত্র পীড়া দিবে তাহা আর বেশি কি! বনলতা বোঝে, এক্ষেত্রে অমরের না থাকার ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক।

নিজের দুঃখ অপরের মনে সংক্রামিত করার দুর্বলতা সব মানুষেরই আছে। বনলতারও যে ছিল না, এমন নয়। তথাপি অমরকে একটু সান্ত্বনা দিবারও প্রয়োজন রহিয়াছে। সোজাসুজি সান্ত্বনার কথা বনলতার মুখে যোগায় না। অমরের মুখের কথায় জোড়া দিয়া রহস্য করিয়া বনলতা বলে,

—আমার জন্যে থাকার ইচ্ছে নেই বলছো। কিন্তু সবটাই তো আর নয়, খানিকটা। বাকিটা কার জন্যে?

বনলতার প্রশ্ন প্রশ্নই। তাহার কোনো অর্থ হয় না। অথচ ইহাই

অমরের মনোকক্ষের ভেজানো দরজাটা হাট করিয়া খুলিয়া ধরে। দীপের আভায় যাহার রেখাচিত্র ভাসিয়া উঠিয়াছে—সে পদ্ম। পদ্মর মুখের কুয়াশায় কৃষ্ণা-রজনীর দুর্জ্ঞেয় রহস্য। অস্পষ্ট বিবর্ণ একটা পুঁথির মতই উপেক্ষিত পদ্ম যেনো অন্ধকারেই আত্মগোপন করিতে চাহিয়াছে—পারে নাই; অমরের অনুসন্ধানী দৃষ্টির কাছে নিজেকে খানিকটা মেলিয়া ধরিয়াছে। আশা আর প্রত্যাশা লইয়াই মানুষ বাঁচে। অমর ভাবে: পদ্মর প্রত্যাশা তাহার জলজ্বলে সিঁথির সিঁদুরে সার্থক হয় নাই। সিঁদ কাটিয়া সোনা চুরি করার আশায় পদ্ম এখন নিশাচরী।

হীরাও নিশাচরী হইয়াছে।

কয়লার গুঁড়াভর্তি আঁকা বাঁকা পথ হাঁটিয়া হাঁটিয়া বেচারী ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কালা পুদিনার গাছ খুঁজিয়া পাওয়া যে এতো কঠিন হইবে কে জানিত। মিশিরজী বলিয়াছেন, কালা-পুদিনা বাটিয়া গাওয়া ঘি আর মধুর সহিত গরম করিয়া লাগাইয়া দিলে বুকের সর্দি নামিয়া যাইবে।

শিবলালের নিকট হইতে তাহার লাল-নীল বাতিটা হীরা চাহিয়া লইয়াছে। লছমীকে সংগী করিয়া বাহির হইয়াছে কালা-পুদিনার খোঁজে।

লছমী ছেলেমানুষ। রাতের গোড়াতেই তাহার ঘুম পায়। সে আর পারে না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘুমের ঘোরে টলিতে থাকে।

বুনো-তুলসীর ঝোপের কাছে দাঁড়াইয়া হীরা অনেকক্ষণ কালা-পুদিনার গাছ খোঁজে। কোথায় কালা-পুদিনা? আগাছার জঙ্গল

ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। মাণিকরাম কিন্তু এই গাছটার কথাই বলিয়াছিল। হীরা শেষবারের মত আলো ফেলিয়া সারা জায়গাটা তীক্ষ্ণ চোখে দেখিয়া লয়।

—লছমি, এ লছমি— : হীরা ডাকে।

কোনো সাড়া শব্দ নাই। পিছন ফিরিয়া হীরা দেখে মাটির উপর উবু হইয়া বসিয়া হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া লছমী ঘুমাইতেছে। ঠেলা দিয়া হীরা তাহাকে জাগায়।

—হুঁস রাখ্, ছোঁড়ি। সাপ কাটেগি তো ব্যাস্—নিদ্ টুট্ যায়গি তুমারী।

—মিলি পোদিনা ? : চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে লছমী প্রশ্ন করে।

—না—! : হীরা মাথা নাড়ে।

—দেখি হ্যায় কভি তু ?

—কিয়া ?

—কালা-পোদিনা ?

—নেহি। : দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে হীরার। বলে,—'চল্—লৌট্ যায়।'

হাতের বাতিটা নীচু করিয়া হীরা আগাইয়া যায়। লছমী তাহার অনুসরণ করে।

ফিরিবার পথে হীরা কি ভাবে কে জানে। চলিতে চলিতে হঠাৎ একসময় দাঁড়াইয়া পড়ে। নাম-না-জানা একটা বুনো ফুলের মিষ্টি গন্ধে জায়গাটা ভরিয়া উঠিয়াছে। বুক ভরিয়া নিঃশ্বাস লয় হীরা। চোখের পাতা আপনা হইতেই বুজিয়া আসে।

চোখের পাতায় নিঃশব্দে পা ফেলিয়া যে আগাইয়া আসে হীরা তাহারই জন্য কালা-পুদিনার খোঁজে গিয়াছিল। লোকটা আর কেহ নয়—

পিটার। হীরার খাটিয়ায় শুইয়া শুইয়া এখনো বুঝি সে জ্বরের ঘোরে ছট্‌ফট করিতেছে। বুকের বেদনায় অমন জোয়ান পুরুষটাও মাঝে মাঝে হীরার হাত ধরিয়া ছোট ছেলের মত কাঁদিতে থাকে। কে জানে বুকের ব্যথায় কাতর হইয়া পিটার এতোক্ষণে চীৎকার করিতেছে কি না!

হীরার গতি হঠাৎ দ্রুত হইয়া ওঠে।

শিবলালের সহিত স্টেশনেই দেখা হইয়া যায়। হীরা কিছু প্রশ্ন করিবার আগেই শিবলাল বলে পিটার সাহেবকে কালই সহরের রেলওয়ে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। লাইন ঠিক হইয়া গিয়াছে। গাড়ি যাতায়াতের আর যখন কোনো অসুবিধা নাই তখন গার্ড সাহেবকে হাসপাতালে রাখিয়া আসার জন্য মাষ্টারবাবু আদেশ দিয়াছেন।

শিবলালকে তাহার রেলকোম্পানীর বাতি ফেরৎ দিয়া হীরা তাড়াতাড়ি নিজের ঘরটিতে ফিরিয়া আসে।

পিটার ঘুমায় নাই। চোখ বন্ধ করিয়া পড়িয়াছিল।

হীরার পায়ের শব্দে চোখ মেলিয়া তাকায়।

—হীরা?

হীরা পিটারের সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। ঘোলাটে দৃষ্টিতে পিটার তাকাইয়া থাকে।

—কাল আপ্‌ সহর যাইয়েগা গার্ড সাহেব?

—হাঁ। : পিটার জ্বরের ঘোরে মাথা নাড়ে।

—কাহে?

—দাওয়াইখানামে রহেনা পড়েগা। বোখার ভারী হ্যায়। থোড়া পানি তো পিলা দে, হীরা।

হীরা জল আনিয়া পিটারকে খাওয়ায়। জল খাইতে গিয়া বিষম

লাগে পিটারের। কাশির বেগ বাড়িয়া ওঠে। বুকে হাত দিয়া বিশ্রী ভাবে পিটার কাশিতে থাকে। গলার শিরাগুলি তাহার নীল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। চোখে জল। কাশিতে কাশিতে পিটারের মুখ বীভৎস—বিকৃত হইয়া ওঠে। হাঁপ ধরিয়া বেচারী বুঝি মারা পড়ে।

হীরা যতোটা পারে পিটারের কাশি থামাইবার চেষ্টা করে। কালা পুদিনার কথাটা তাহার বারবার মনে পড়িতেছে।

অনেক কষ্টে পিটারের কাশি থামে — যন্ত্রণা থামে না। বরং, আরো বাড়িয়া যায়।

সরিষার তেল গরম করিয়া হীরা পিটারের বুকে তেল মালিশ করিতে বসে।

জ্বরের ঘোরে, বুকের যন্ত্রণায় পিটার ছট্‌ফট করিতে করিতে একসময় কখন যেন ঘুমাইয়া পড়ে।

তখন অনেক রাত। হীরা পিটারের পাশ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ায়।

দাওয়ায় আসিয়া মাটির উপর চুপচাপ বসিয়া থাকে হীরা। কৃষ্ণপক্ষের এক ফালি রুগ্ন চাঁদ উঠিয়াছে আকাশে। সেই আলোয় দূরের সিগন্যাল্‌টা স্পষ্ট দেখা যায়। দেখা যায় তাহার লাল চোখ।

আগামী কাল ওই সিগন্যালের আলোটা নীল হইবে। পিটার সাহেব চলিয়া যাইবে।

হীরার বুকের মধ্যে আশ্চর্য একটা ব্যথা অনেকক্ষণ হইতেই পাক দিয়া উঠিতেছিলো। এ ধরনের অদ্ভুত বেদনার সহিত জীবনে একবার মাত্র তাহার পরিচয় হইয়াছে—দিদি যখন মারা যায় ; তখন।

হীরাবাঈ পানওয়ালী। অন্ততঃ সেই নামেই তাহার পরিচয়। চুণ,

শয়েরের রঙে তাহার হাতের আঙুল রাঙা হইয়াছে—হীরা তাহা জানে; দেখে, বোঝে। মাত্র ক'দিনের ব্যতিক্রমে শয়তান পিটারটা তাহার বুকের কঠিন সাদা হাড়গুলাকে যে করুণরঙীন এক বিচিত্র রঙে রাঙা করিয়া দিবে তাহা হীরা জানিত না। আজো বুঝি জানে না।

পিটার সাহেব সহরের হাসপাতালে চলিয়া যাইবে—হীরা খালি সেই কথাটাই তখন হইতে ভাবিতেছে। আর সেই ভাবনায় ভর করিয়া বোবা একটা ব্যথা জাগিয়া উঠিয়াছে; তাহার বুকে পাক খাইতেছে। কেমন যেন ফাঁকা লাগে নিজেকে।

হীরা ভাবিয়া কুল পায় না—মেজাজটা তাহার বিগড়াইয়া গেলো কেনো? শয়তান পিটার সাহেবই সেদিন তাহাকে ছল করিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছিল। আত্মরক্ষার জন্যে সেদিন হীরা ধারাল ভোজালিখানি তুলিয়া লইয়াছে। পিটার ভয়ে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়। মুখের উপর হীরা দরজা বন্ধ করিয়া দেয়।

পরের দিন অনেক বেলায় জ্বরের ঘোরে টলিতে টলিতে পিটার আবার হীরার ঘরে আসিয়া ঢোকে। খাটিয়ার উপর কোনোরকমে অচৈতন্য দেহটাকে বিছাইয়া দিয়া পিটার ভুল বকিতে থাকে। হীরা সব কথা বুঝিতে পারে না। যেটুকু বোঝে তাহা হইতে বুঝিতে পারে—সারা রাত বৃষ্টির জলে ভিজিয়া, ঝোড়ো হাওয়া খাইয়া পিটারের জোর জ্বর আসিয়াছে। পিটারের কোটটা তখনও আল্‌নায় আগের মতই টাঙানো ছিল। হীরা সেদিকে তাকাইয়া বোকার মত বসিয়া থাকে। পিটার বকিয়া যায়—হীরা তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া দিবার পর কতোক্ষণ সে ডাকাডাকি করিয়াছে, কতোবার আবেদন জানাইয়াছে; অন্ততঃ কোটটাও যাহাতে ফেরৎ পাওয়া যায়। হীরা দরজা খোলে নাই।

অগত্যা পিটারকে সেই প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়া ফিরিতে হয়। শীতে, জলে সারা রাত পিটার লাইন হইতে গড়াইয়া পড়া ব্রেকের মধ্যে কোমর পর্যন্ত জলে ডুবিয়া রাত কাটায়। হাওয়ার চাবুক তাহার গায়ের রক্ত চুষিয়া খাইয়াছে।

পিটারের গায়ে হাত দিয়া হীরা দেখে সত্যই লোকটার গায়ে আগুন ছুটিতেছে।

হীরা এবারও বোকার মত নিজের কাঁথা আর কম্বল দিয়া পিটারের সারা গা ঢাকিয়া দেয়। মনে মনে কি জানি কেনো হঠাৎ নিজেকে অপরাধী বলিয়াই তাহার মনে হয়।

পিটারের জ্বর যতোই বাড়ে, যতোই সে যন্ত্রণায় ছটফট করে, দিন যায়—ততোই হীরার মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মায়—পিটারের অসুখের জন্য সে দায়ী। একটা নিরাশ্রয় মানুষকে অমনভাবে বাহির করিয়া দেওয়া তাহার উচিত হয় নাই। হীরা যদি তাড়াইয়া না দিত—পিটারের অসুখ করিত না।

এবার আর হীরা পিটারকে তাড়ায় না। যেন অপরাধ ক্ষালনের উপায় হিসাবেই পিটারকে নিজের খাটিয়াটা ছাড়িয়া দেয়। মিশিরজীর কাছ হইতে ওষুধ চাহিয়া আনিয়া পিটারকে খাওয়ায়। পাশে বসিয়া রাত জাগে; বুকে তেল মালিশ করে।

পিটার কাল চলিয়া যাইবে। সহরের বড় হাঁসপাতালে তাহাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভালো বিছানার উপর শোয়াইয়া রাখা হইবে। সাদা পোষাক পরা মেমসাহেবরা জুতার মৃদু আওয়াজ তুলিয়া বারবার পিটারের কাছে যাওয়া-আসা করিবে। সেখানে বড় বড় ডাক্তার। প্রশ্ন করা দূরে থাক, তাহাদের গম্ভীর মুখের পানে তাকাইতেই ভয় হয়। পিটার যে কেমন থাকে তাহা জানা মুস্কিল।

সহরের বড় হাসপাতাল হীরা দেখিয়াছে। হাসপাতালের ভিতরও ঢুকিয়াছে। বছর চারেক আগের কথা। এখানে আগে যে মাদ্রাজী ষ্টেশনমাষ্টার ছিল তাহার বউ দেবকীর সঙ্গে হীরার গলায়-গলায় ভাব। দেবকীর একবার খুব অসুখ করে। তাহাকেও সহরের বড় হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। ট্রেনে চাপিয়া কয়েকবারই হীরা তাহাকে দেখিতে গিয়াছিল। হাসপাতালের রকমসকম দেখিয়া কাহাকেও সে একটা প্রশ্ন করিবার মত সাহস সংগ্রহ করিতে পারে নাই। দেবকীও বেহুঁস হইয়াই পড়িয়া থাকিত। তাহার সহিত কথা বলিলে মেমসাহেবরা ধমক দিয়া হীরাকে চুপ করাইয়া দিত।

দেবকী মারা গেল। কাণাঘুষায় হীরা শুনিয়াছে দেবকীর বুক দিয়া রক্ত উঠিত। রক্ত উঠিয়াই সে মারা গেল।

পিটার যদি মারা যায় ?

ঝোড়ো হাওয়ায় হঠাৎ-উড়িয়া-আসা ধূলার মতই কথাটা হীরার মনে আসে। বুকটা তাহার কাঁপিয়া ওঠে, চোখ দুটোও কর্‌কর করিতে থাকে।

কৃষ্ণপক্ষের রুগ্ন চাঁদ ডুবিয়াছে—। সিগন্যালের লাল আলোটা কেমন যেন অস্পষ্ট। পিটারের চোখের দৃষ্টি ওইরকম রক্তাক্ত ঘোলাটে।

হীরার বুক বহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে। একটা কথাই শুধু তাহার মনে পড়ে— : অমনভাবে ঝড়-বৃষ্টির রাত্রে পিটারকে তাড়াইয়া দেওয়া তাহার উচিত হয় নাই।

উচিত-অনুচিতের কোনোকালেই বাঁধা-ধরা কোনো সংজ্ঞা নাই। একজনের কাছে যাহা উচিত, অন্যের কাছে তাহা অনুচিত। অতো বড় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটার একতরফা জয়ের মধ্যে যথেষ্ট ঔচিত্যবোধের নিদর্শন

নাই। মানুষ তাহার স্বার্থের তাগিদে অনেক উচিতকে অনুচিত করে ; আবার কতো যে অনুচিত উচিত হইয়া ওঠে তাহার হিসাব মেলা ভার।

পদ্ম অনেক ভাবিয়াছে। ভাবিয়া কুল পাওয়া যাওয়া না—এমন একটা ভাবনাই সে ভাবিয়াছে ; তাই ভাবিয়াও কোনো কুল পায় নাই। অমরের কাছে অমন করিয়া নিজের হীনতা প্রকাশ করা তাহার উচিত হয় নাই। অমর নিশ্চয় মনে মনে পদ্মর সম্বন্ধে কুৎসিত ধারণা লইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। হয়তো ভাবিয়াছে—হীরার মত ছোটলোক একটা মেয়েরও যে আত্মমর্যাদাজ্ঞান আছে, পদ্মর তাহা নাই। হীরার নীতিজ্ঞান থাকার কথা নয়—। সমাজের যে স্তরে নীতির ছোটখাটো লম্বা-চওড়া অনেক রকম বিবৃতি চব্বিশ ঘণ্টা শুনিতে পাওয়া যায়, হীরা সে সমাজের লোকও নয়। অথচ প্রাথমিক নীতিটা হীরা নিজে নিজেই শিখিয়া ফেলিয়াছে। নিজেকে সে সুলভ করে নাই। আর পদ্ম— ? দুর্লভ পদ্মই সুলভ হইয়া গিয়াছে।

পদ্ম ভাবে—অমর বোধ হয় সবই বুঝিয়াছে। বুঝিয়াছে স্বামী, সংসার, সমাজ, সব কিছু থাকা সত্ত্বেও পদ্ম স্বৈরিণী। যে পরিবেশের মধ্যে পদ্ম আছে তাহার প্রতি ওর কোন মোহ নাই—মায়াও নয়। পরিবেশটা পদ্মর কাছে লৌকিক, বাহ্যিক। আসলে পদ্মর কিছুই নাই। না প্রেম, না পবিত্রতা।

প্রেম, পবিত্রতা !

কিসের প্রেম, কেনোই বা পবিত্রতা ? —পদ্মর ঠোঁটের আগায় বাঁকা হাসি ফুটিয়া ওঠে। প্রেম বলিয়া, পবিত্রতা বলিয়া জগতে কিছু নাই। এ শুধু ফাঁকা বুলি। এ জগতে প্রেম বলিয়া সত্যই যদি কিছু থাকিত, পদ্ম এমন করিয়া পাঁকে পড়িয়া থাকিত না।

চিন্ময়দাকে পদ্মর মনে পড়ে। পদ্মদের মফস্বল সহরের একচ্ছত্র

যুবরাজ। মোটা খদ্দরের পায়জামা আর সার্ট পরিয়া হাতে কালো চামড়ার ব্যাগ ঝুলাইয়া চিন্ময় সমস্ত সহরটা টহল দিয়া বেড়াইত। সর্বত্র তাহার অবাধ গতি, অব্যাহত আত্মপ্রসার। চিন্ময়দার অনেক ভক্ত। ছেলেরা ভক্তির ঠেলায় চিন্ময়কে ঠেলিয়া স্বর্গে তুলিয়াছিল। তাহার মুখের কথায় হাতবোমা ছোঁড়া হইতে সুরু করিয়া কেরানী পিতার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের চুরি করা টাকায় দেশসেবার তহবিল ভারী করিতেও তাহারা পিছপা হয় নাই। মেয়েমহলে স্বয় সেন আকাশপ্রদীপের মতই চোখ আর মনের বিস্ময় যোগাইয়া ভাসিয়া গিয়াছে। নিজেকে ধরা দেয় নাই। যেদিন হাওয়ার টাল সামলাইতে না পারিয়া চিন্ময়রূপী আকাশপ্রদীপেও আগুন লাগিল, দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—সেদিন ছেঁড়াখোঁড়া দগ্ধ দেহটা লইয়া চিন্ময় পদ্মর কোলেই ছিটকাইয়া পড়ে।

ছেলের দল ক্ষ্যাপা কুকুরের মত চিন্ময়কে খুঁজিয়া ফিরিতেছে। পুলিশ হইতে পাঁচ পাঁচটা ওয়ারেণ্ট।

পদ্মর আজও বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে—সেদিনের নাটকীয় পরিস্থিতির নায়ক-নায়িকারা অভিনয় কেমন জমাইয়া তুলিয়াছে।

রাত তখন বোধ হয় বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। প্রচণ্ড শীতের ঠেলায় মফস্বল সহরের অমন যাত্রার আসরটাও জমে নাই! পদ্ম যাত্রা দেখিতে গিয়াছিল—ভালো না লাগিলেও বসিয়াছিল। হঠাৎ ছোট একটি ছেলে আসিয়া কাণে কাণে জানায়—বাহিরে কে একজন তাহাকে একটু ডাকিতেছে। নাম বলিল চন্দন।

চন্দন—? বাচ্চা ছেলেটির সাথে পদ্ম তৎক্ষণাৎ মেয়েদের আসর হইতে বাহির হইয়া আসে। চায়ের দোকানের সামনেই মাথা, কাণ মুড়িয়া একটা লোক দাঁড়াইয়াছিল। গালময় দাড়ি। ছেলেটি আঙুল দিয়া তাহাকে দেখাইয়া দিল।

পদ্ম ভালো করিয়া লোকটিকে দেখিবার আগেই সে দ্রুতপায়ে আগাইয়া আসে। কাছাকাছি আসিয়া চাপা গলায় বলে,

—আমি চিন্ময়। এখানে নয়,—একটু ওধারে চলো। লোকের চোখে পড়তে চাই না।

অন্ধকারে আসিয়া চিন্ময় বলে,

—অনেক কষ্টে লুকিয়ে এসেছি। তোমার কথাই মনে পড়ছিলো আজ ক'দিন ধরে। আমায় একটু আশ্রয় দেবে ?

চিন্ময়ের গলায় কখনো আবেদন, অনুরোধের সুর বাজিতে পারে পদ্ম ভাবে নাই। তাহার মিনতিভেজা কণ্ঠস্বরে পদ্ম অবাক মানিল।

—সকলেই আমার বিপক্ষে। শত্রুর অভাব নেই। কয়েকটা দিন আমায় তোমার কাছে লুকিয়ে রাখো, পদ্ম! তুমি ছাড়া আজ আপনার বলতে আমার কেউ নেই।

চিন্ময় তাহার হাত জড়াইয়া ধরিয়াছিল। পদ্মর সাধ্য ছিলো না—সে হাত ছাড়ায়।

পদ্ম চিন্ময়কে লুকাইয়া নিজের ঘরে আনিয়া তোলে।

প্রৌঢ়, অন্ধ পিতাকে লইয়া পদ্মর সংসার। সদানন্দবাবু সদানন্দই। মাটির মানুষ। অসম্ভব ভালো লোক। কাজে কাজেই চিন্ময়কে নিজেদের বাড়িতে লুকাইয়া রাখিতে পদ্মর খুব অসুবিধা হয় নাই।

পদ্মদের বাড়িতে মাত্র দুখানি ঘর। একটি সদানন্দবাবুর, অপরটি পদ্মর। সদানন্দবাবুর ঘরে রাত কাটাইবার মত সাহস পদ্মর হয় নাই। চিন্ময়ও তাহাতে বাধা দিয়াছিল। চিন্ময়ের আত্মগোপনের খবরটা ভালমানুষ সদানন্দবাবুও কিভাবে গ্রহণ করিবেন—তাহা আন্দাজ করা সম্ভব হয় নাই। চিন্ময় বারবার অনুরোধ করিয়াছে, যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন না করিলে তাহার ভাগ্যে জেলের দরজা পুরাপুরি খুলিয়া যাইবে।

পদ্মও তখন কি যে ভাবিয়াছিল, কে জানে— । চিন্ময় তাহার মনে দাগ কাটিয়াছিল অনেকদিন আগেই। সে দাগ তেমন গভীর নয়। হয়তো চিন্ময় দুর্লভ বলিয়াই পদ্ম তেমন করিয়া কোনদিনই তাহাকে মনের গভীরে টানিয়া লইতে পারে নাই। সুযোগটা হঠাৎ আসিল। অস্পষ্ট একটা স্বপ্ন দিনের আলোতেও যখন বাস্তবরূপ লইয়া দেখা দিল— পদ্ম তখন নিজেকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। আর চিন্ময়— ? চিন্ময় দিনে কতোবার করিয়া যে ছিন্নতন্ত্রী বীণার মত করুণ বেসুরো সুর তুলিয়া পদ্মর সহানুভূতি ভিক্ষা করিয়াছে, স্তুতিবাদে তাহার মন গলাইয়াছে—তাহার হিসাব হয় না। চিন্ময়ই পদ্মকে রাত্রের অন্ধকারে বিপ্লবী দার্শনিকতায় মুগ্ধ করিয়া মনে মনে বিবাহ করার প্রেরণা যোগাইয়াছে। পরবর্তী ঘটনার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই। রাত্রিবাসের উত্তপ্ত উত্তেজনা একদিন ফিকা হইয়া আসে। সদানন্দবাবু হয়তো জানিতে পারিয়াছিলেন। দূরদেশে ঘর গড়িবার প্রলোভন দেখাইয়া চিন্ময় পদ্মর যৎসামান্য গহনাগুলি লইয়া রাত্রিশেষের অন্ধকারে মিলাইয়া যায়।

চিন্ময় আর ফেরে না।

হাজার লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা সত্ত্বেও কথাটা প্রকাশ হইয়া যায়। কাণাকাণি, চোখ টেপাটেপি হইতে সুরু করিয়া শেষ পর্যন্ত টিটকারী এবং গালিগালাজ চলিতে থাকে। পুলিশ আসিয়া পদ্মকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে।

সদানন্দবাবু বহুদিনের বাসস্থান তুলিয়া দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিতে বাধ্য হন। দু-একটা ভালো সম্বন্ধ পদ্মর জুটিয়াছিল। বিবাহ হয় নাই। চিন্ময় সংক্রান্ত গোপন খবরটা উড়ো-চিঠিতে কে যেন পাত্রপক্ষকে জানাইয়া দিয়াছিল। পদ্মর ভাগ্যে দোজবরে হেমন্তবাবুই

কেমন করিয়া না জানি জুটিয়া গেল।

চিন্ময়ের আঘাত দিবার শক্তি যতোই তীব্র হোক না কেনো, সে আঘাত সহ্য করিয়া লওয়ার ক্ষমতা পদ্মর ছিলো। বেশির ভাগ মানুষেরই থাকে। সহ্যশক্তিটা মানুষের বাঁচিবার তাগিদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই বাঁচিবার বাসনা যাহার যত বেশি সহ্য করিবার শক্তিও তাহার তত অধিক।

পদ্ম বোকা নয়। চিন্ময়-পর্ব তাহার জীবনের আদি হইলেও অন্ত-পর্ব যে হইতে পারে না সহজভাবেই পদ্ম সে কথা বুঝিতে পারিয়াছিল। জীবন বলিতে যে যাই বুঝুক, পদ্ম বুঝিয়াছিল—বাঁচিয়া থাকার সুখ, সুবিধা, স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখাই জীবন। পাপ, পুণ্য, ন্যায়, অন্যায়—ইত্যাদি আভিধানিক শব্দগুলির অর্থ ধরিয়া জীবনের বিচার চলে না। বিচার করিতে যাওয়ার মত মূর্খতাও আর নাই। স্রোত-রুদ্ধ হইয়া স্রোতস্বিনী শুকায়—মন-রুদ্ধ হইলে মানুষ মরে। মৃত্যু জীবন নয়, মৃত্যুমুক্তিই জীবন। এ জীবন তাই আকাশের মতই বিশাল, উদার। তাহার বুকে কতো ঝড় ওঠে ; কতো বৃষ্টি, রোদ, কতো ঘুমন্ত ছায়াপথ, বহ্নিদীপ্ত ধূমকেতু দেখা দেয় আর মিলায়। কে তাহাকে মনে রাখে ? বৈশাখের ঝড় শ্রাবণে হারাইয়া যায়, শ্রাবণের অশ্রু শরতের সলাজ হাসিতে মুছিয়া যায়। সব ভুলিয়াই আকাশ বাঁচিয়া থাকে।

পদ্ম তাহার জীবন হইতে ঝড় ঝাপ্টার দাগগুলি মুছিয়া ফেলিয়া আকাশের মতই বাঁচিয়া থাকিবে।

বাঁচিয়া থাকার জন্য একটা অবলম্বন দরকার।

হেমন্তবাবু পদ্মর অবলম্বন। পেটের অন্ন, মাথা গুঁজিবার আশ্রয়, দেহ আচ্ছাদনের জন্য বস্ত্র, রোগ হইলে ঔষধ—এক কথায় বাঁচিয়া

থাকার জন্য যাহা প্রয়োজন হেমন্তবাবু সবই যোগান। আর যোগান বলিয়াই তো তিনি পদ্মর অবলম্বন।

তবু পদ্ম ঠিক যেন বাঁচিয়া নাই। বরং বলা ভালো, বাঁচিয়া থাকার যে পরিপূর্ণ সুখ, সে সুখের সহিত তাহার পরিচয় নাই। কেনো যে—পদ্ম স্পষ্ট ভাবেই তাহা অনুভব করিতে পারে। এমন একটা অভাব তাহার—যে অভাবের তীব্রতাটা শুধু নিজেই অনুভব করা যায়—কাহাকেও বোঝানো চলে না। আজ দীর্ঘ চার পাঁচ বছর ধরিয়া পদ্ম সেই অভাবের জ্বালায় তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয় করিতেছে।

হেমন্তবাবু প্রথম প্রথম অতোটা বুঝিতে পারেন নাই। ক্রমশই পদ্মর অব্যক্ত অভিযোগ যে কি তাহা জানিতে পারিলেন। বুঝিলেন—চল্লিশোত্তর বয়সে তাঁহার মত ভগ্নস্বাস্থ্য ভদ্রলোকের বিবাহ করা উচিত হয় নাই। কিন্তু বুঝিলে কি হইবে—যে গাছ মূল সমেত কাটা হইয়া গিয়াছে, যাহার আর চারা নাই হেমন্তবাবু সে গাছের শাখায় একটি সবুজ পাতাও যে আর দেখিবেন এ আশা কি করিয়া করেন!

তবু—।

পদ্ম একদিন বলিয়া ফেলে,

—ছাই পাঁশ ওসব কী মাথামুণ্ডু গেলো!

এক গ্লাস জল সমেত একটি কবিরাজী বটিকা গলাধঃকরণ করিয়া হেমন্তবাবু লজ্জায় প্রায় অসাড় হইয়া পড়েন।

—বলে ওষুধটা নাকি ভালো! : আমতা আমতা করিয়া জবাব দেন হেমন্তবাবু।

—আমার মাথার পিণ্ডি। ভালো—! কতো তোমার ভালো ওষুধই তো খেলে। কোন উপকারটা পেলে বলতে পারো? উল্টে আরো পাঁচটা উপসর্গ নিয়ে ভুগছো।

হেমন্তবাবু চুপ করিয়া থাকেন, জবাব দেন না। জবাব দিবার কিই বা আছে! যে ভুল হইয়া গিয়াছে তাহা শুধরাইবার জন্যই তো এই সব ব্যর্থ চেষ্টা।

হেমন্তবাবুর মুখের পানে তীব্র চোখে চাহিয়া পদ্ম বলে,

—আর যদি কোনোদিন তোমায় ওই মাথামুণ্ডু গিলতে দেখি ঠিক জেনো আমি গলায় দড়ি দেবো।

হেমন্তবাবু ভয় পান। ভাবিয়া দেখেন, অযথা অর্থ ব্যয় করিয়া অসম্ভবকে সম্ভব করার নেশায় মশগুল থাকা অর্থহীন। পদ্মও স্বস্তি পায়। যাহা হইবার নয় তাহার জন্ত হেমন্তবাবুর একটানা আজেবাজে ওষুধ খাওয়া তাহার মোটেই পছন্দ হইত না। দিন দিন হেমন্তবাবু আরো ক'টা রোগ-উপসর্গ বাধাইয়া বসিতেছিলেন। শেষ পর্যন্ত বুকের রোগটা তাঁহার যেন আরো বাড়িয়া যায়। সপ্তাহখানেক শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভীষণ ভয় পাইয়াছিল পদ্ম। ক'দিন তো ভাবনায় তাহার চোখের পাতা এক হয় নাই।

মনে পড়ে রোগশয্যা হইতে উঠিয়া হেমন্তবাবু একদিন প্রশ্ন করিয়াছিলেন,

—একটা কথার জবাব দেবে ছোট বৌ, রাগ ক'রবে না— ?

—না গো, না। বলো তোমার কি কথা ? : পদ্ম দুধের গেলাস আগাইয়া দিয়া বলিয়াছিল।

—অসুখের সময় একদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি মরে গিয়েছি। কারা যেন আমায় শশ্মানে নিয়ে যেতে এসেছে। তুমি তখন ওই বারান্দার মাঝে। বেতের মোড়ায় বসে। হেঁট হয়ে পায়ে আলতা পরছো। হঠাৎ চোখ তুলে তাকালে। দেখলে শশ্মানযাত্রীদের। কোনো কথাটি বললে না; শুধু ঘরের মধ্যে উঠে এসে ওদের মুখের ওপরই

দরজা দিলে বন্ধ করে। : হেমন্তবাবু থামিয়া গিয়াছিলেন।

—তারপর— ? : পদ্ম প্রশ্ন করিয়াছিল। তাহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন বাতাসের চাপে ভার হইয়া উঠিয়াছিল।

—তারপর আর কি, আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। চোথ খুলে দেখি আমার মাথার পাশে মাথা এলিয়ে ঘুমোচ্ছো তুমি।

বুক ঠেলিয়া আসা দীর্ঘনিঃশ্বাসটা কোনোরকমে চাপা দিয়া পদ্ম প্রশ্ন করিয়াছিল।

—খুব স্বপ্ন তো ! যাকগে— ; কই কি জানতে চাও বললে না ?

—আমি মরে গেলে তুমি কি করবে ? : হেমন্তবাবু পদ্মর চোখে চোখ রাখিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন।

পদ্ম অদম্য বিস্ময়ে হেমন্তবাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া বোবা হইয়া গিয়াছিল। বেশ খানিকটা পরে উত্তর দিয়াছে,

—আমার তো আর কেউ নেই। শেষ পর্যন্ত তোমার কাছেই গিয়ে হাজির হবো।

পদ্মর উত্তর শুনিয়া হেমন্তবাবু পাথরের মতন নির্জীব, নিস্পন্দ হইয়া বসিয়াছিলেন। আর পদ্ম রান্নাঘরে আসিয়া গরম কড়াইয়ের হাতল দুটা সজোরে চাপিয়া ধরিয়াছিল। ফোস্কা পড়িয়া হাত দুটি তাহার জ্বালা করিতেছিল সত্যি, তবু সে জ্বালা পদ্মর মনের জ্বালার তুলনায় শতগুণ শীতল।

'শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু·········'

দাওয়ায় তুলসী তলায় বসিয়া গোঁসাইজী আপন মনে গাহিতেছিলেন। মৃৎ-প্রদীপের অনুজ্জ্বল শিখাটি বার বার কাঁপিয়া উঠিতেছে। আলো-অন্ধকারের ভগ্নাংশ তুলসী মঞ্চের খানিকটা জায়গা জুড়িয়া কাঁপে।

যেন গোঁসাইজীর গানের পদটির সহিত তাল রাখিয়া মাথা নাড়ে।

কুসুম দাওয়ার এককোণে গালে হাত দিয়া চুপচাপ বসিয়াছিল। জায়গাটা অন্ধকার। তাহার পায়ের কাছে কয়েকটি বেলফুলের গাছ। ফুলের মিষ্টি গন্ধে বাতাস ভরিয়া ওঠে। কীর্তনের সুরে মনের সুপ্ত ব্যথাটা জটখোলা সুতার মত আঁকাবাঁকা ভাবে ছড়াইয়া পড়ে। 'শীতল বলিয়া......'। সত্যই তো; শীতল বলিয়াই কুসুম চাঁদ সেবিয়াছিল। অথচ চাঁদের স্পর্শে কুসুমের মন, কেন যে শান্ত শীতল হয় না, কে জানে! দিন দিন কুসুমের যেন কি হইতেছে। সবসময় ভাসা ভাসা একটা চিন্তায় তাহার মন ভরিয়া থাকে। ক্ষণে ক্ষণে ও অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। কুঁয়ায় জল তুলিতে গিয়া দড়ি হাতে চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকে। কখনো বা বুক পর্যন্ত ঝুঁকিয়া কুঁয়ার জল দেখে; ঠাকুরের ঘর পরিষ্কার করিবার সময় ভিজা মেঝেটায় মাথা রাখিয়া দীর্ঘসময় পড়িয়া থাকে। মনে মনে বলে, ঠাকুর, আর আমি পারি না। বড্ড কষ্ট হয় বুকে। বাঁচাও, আমায় তুমি বাঁচাও।

বুঝি দমকা হাওয়ায় কুসুমের চোখের পাতা বুজিয়াছিল। চোখ খুলিয়া দেখে তুলসী মঞ্চের প্রদীপ নিভিয়াছে। শোনে, গোঁসাইজী গাহিতে-ছেন—: 'অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।'

তাই তো, সে যা চাহিয়াছে তাহা পায় নাই। অমৃত সাগরে ডুব দিয়াছে, সুধা জোটে নাই, সুধাকর জুটিয়াছে। সুধাকর কি আর ফিরিবে না?

সেই যে ঝড়জলের দিন সকাল হইতেই সুধাকর উধাও হইয়াছে। আজ পর্যন্ত আর সে ফিরিল না। খবর লইতে গোঁসাই বাকি রাখেন নাই। পাওয়ার হাউসের লোকে বলে, সুধাকর কয়দিন হইতেই ডিউটিতে আসে নাই। সুধাকরের আড্ডা মতিলালের বাড়িতেও

গোঁসাইজী নিজে গিয়াছেন। মতিলাল বলিয়াছে, সুধাকর আর তাস খেলিতে আসে না। সুধাকর সেদিন সকালে পাঁচটি টাকা ধার করিতে আসিয়াছিল। তাহার পর সুধাকরের চুলের টিকিটি পর্যন্ত আর সে দেখে নাই। কুসুম ভাবে : তাইতো মানুষটা গেল কোথায়। প্রথম প্রথম প্রক'দিনই ভাত বাড়িয়া কুসুম বসিয়া থাকিয়াছে—সুধাকর আসিবে। সবটুকু ভাত চোখের পলকে নিঃশেষ করিয়া বলিবে; আর দুটো দিবি নাকি রে, কুসুম ?

বাড়া ভাত নষ্ট হইয়াছে—সুধাকর ফেরে নাই।

গোঁসাইজী কুসুমকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—। কুসুম কোনো উত্তর দেয় নাই। নীরবে শুধু কাঁদিয়াছিল। কি ভাবিয়া গোঁসাইজী বলিয়াছিলেন,

—কাঁদিস নে, মা। যাবে কোথায় লক্ষীছাড়া। ঠিক ফিরে আসবে।

কুসুম বুঝিয়া পায় না, সুধাকরের এতো রাগ হইবার কারণ কি ? না হয় জেদ চড়িয়া গিয়াছিল তাহার, হয়তো সে চাতুরী করিয়া চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছিল। তাই বলিয়া গৃহত্যাগ করিবে।

পুরুষ মানুষগুলো বড় অবুঝ। কুসুম যে কেন চাঁদের সেবা করে, অমিয় সাগরে সিনান করিবার জন্য ডু-ব দেয়—সুধাকর তাহা বোঝে না। জোর করিয়া তাহার দাবীটুকু মিটাইয়া লইতে চায়। সুধাকরের দাবী কুসুম অস্বীকার করিতে পারে না। জগতে ইহাই তো নিয়ম। কিন্তু কুসুম নিয়মের ব্যতিক্রম। তাহার মন যে তাহার নিজস্ব নয়, এই দেহটাও বনমালীর পায়ে সঁপিয়া দেওয়া।

'তিল তুলসী দিয়া এ দেহ সমর্পিলু… ।' সুধাকর কেনো বোঝে না, কুসুম তাহার মা রাধারাণীর মৃত্যুশয্যার পাশে বসিয়া শপথ করিয়াছে

জীবন ভরিয়া সে গোবিন্দের নৈবেদ্য সাজাইবে। কৃষ্ণ তাহার স্বামী। তিনিই তাহার দেহ-মনের প্রভু। তাঁহার পায়ে উৎসর্গ করা এ ফুল তো আর কাহাকেও দেওয়া যায় না। সে যে বড় পাপের কথা। ছি ছি তাই কি হয়।

তবে সুধাকর কে—?

সুধাকর যে কে কুসুম নিজে তাহা ভালো করিয়া জানে না। মা মারা যাইবার পর গোঁসাইজী কুসুমকে লইয়া তাঁহার নিজস্ব গ্রামে চলিয়া আসেন। সেখানে আসিয়াই কুসুম জানিতে পারে সুধাকর তাহার স্বামী। গোঁসাইজীই তাহাকে কথাটা বলিয়াছিলেন। গোঁসাইজীর কথা কুসুম অবিশ্বাস করিতে পারে না। তাহার মাও গোঁসাইকে দেবতার মত ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। কখনো কখনো গোঁসাইজী যখন তাহাদের বাড়িতে আসিতেন তখন রাধারাণী প্রাণ ভরিয়া তাঁহার সেবা করিতেন—তবু যেন তাঁহার আশা মিটিত না।

গোঁসাইজীর মুখে কুসুম যেদিন শুনিল সুধাকর তাহার স্বামী—সেদিন সে কম বিস্মিত হয় নাই। জিবের ডগায় একটা প্রশ্ন আসিয়াছিল।

—মা তো আমায় কিছু বলেনি, ঠাকুর।

—আমার নিষেধ ছিলো। খুব ছেলেবেলায় তোদের কণ্ঠি বদল হয়েছিলো, কুসুম। তুই তখন সাত বছরের।

কুসুম আকাশ হইতে পড়িয়াছে। তাহার কণ্ঠি বদল হইয়াছে অথচ মা কিছুই বলেন নাই। কেনো? না হয় নাই বলিলেন কিন্তু মায়ের মৃত্যুশয্যার পাশে বসিয়া কুসুম যখন ভগবানকে তাহার দেহমন সর্বস্ব দান করিল—তাহার পর আর তো সে সুধাকরের স্ত্রী হইতে পারে না—এ কথাটাও কি মার একবারও মনে হয় নাই। না কি মা জানিতেন না, একদিন কুসুম তাহার কণ্ঠি-বদল-করা স্বামীর কথা জানিতে পারিবে!

অনেক ভাবিয়াও কুসুম এ সবের কোন উত্তর পায় নাই। গোঁসাইজীকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেও তাহার সাহসে কুলায় নাই।

—কুসুম : অন্ধকার হইতে গোঁসাই ডাকেন।

ধড়মড় করিয়া কুসুম উঠিয়া বসে।

কাছে আসিলে গোঁসাই কুসুমকে বলেন,

—বোস্; এখানে বোস্। আমার কাছে।

কুসুম গোঁসাইজীর পাশে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

—কি ভাবছিলি!

কুসুম এবারও নিরুত্তর থাকে। জবাব দেয় না।

গোঁসাই তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলেন,

—শাস্ত্রে আছে মনশ্চিন্তা মৃত্যুসম। কার জন্যে তুই এতো ভাবিস, মা? সুধাকর জ্ঞানহীন, ইন্দ্রিয়াসক্ত। সংসারের মধ্যে তাকে ফিরে আসতেই হবে। তার শান্তি সংসারে, গৃহে। বাইরে কতোদিন থাকবে—?

—এ সংসারে সে সুখ পায় না—। : বলিবার ইচ্ছা ছিল না তবু অসতর্ক মুহূর্তে কথাটা কুসুমের মুখ হইতে বাহির হইয়া যায়।

—সুখ কি হাট বাজারে বেচাকেনা হয়, মা! সুখ অন্তরের জিনিস। কেউ কৃষ্ণ নামে সুখী, কেউ অর্থলোভে সুখী। যার যেমন মন, সে তেমন জিনিসেই সুখী হয়।

কুসুম কোনো কথা বলে না। মনে মনে ভাবে, সুধাকরকে সুখী করিতে হইলে কুসুমকে তাহার ধর্ম নষ্ট করিতে হইবে। দেহ, মন—সবই অশুচি, অপবিত্র করিয়া—এতোদিনের একনিষ্ঠ বিশ্বাস জলাঞ্জলি দিয়া তবেই না তাহা সম্ভব।

কথাটা মনে পড়িতে কুসুমের গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। ভয়ে নয়

দৃপায়। একটা মাছি যেন আবর্জনার স্তূপ হইতে উড়িয়া তাহার মুখে আসিয়া বসিয়াছে। বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া কুসুম চুপচাপ বসিয়া থাকে।

অন্ধকারে গোঁসাইজী কুসুমকে দেখিতে পান না। আপন মনেই বলিয়া চলেন,

—এ সংসার বড় কঠিন ঠাঁই, মা। এখানে পদে পদে বাধা, বিঘ্ন, লোভ, প্রবঞ্চনা। আমাদের নিত্যকার জীবনে রিপুর দ্বন্দ্ব, প্রবৃত্তির বাঁধন। এদের দু'হাতে ঠেলে, সরিয়ে, এগিয়ে যাবার মত মন চাই। মনই সব; মনের জমিতেই ফসল ফলে। তেমন মন থাকলে সোনাও ফলবে, মা। এ মনই মায়া, এ মনই জ্ঞান, এ মনই সুখ।

—মন যা চায়, তাই কি ভালো ঠাকুর? মন্দও যে মন চায়—

—চায় বৈকি মা, অবশ্যই চায়। যে মন কৃষ্ণ চায়, সেই মনই কামিনী চায়। কিন্তু কায়মনোবাক্যে যে চাওয়া, সেই চাওয়াই কামনা—মন-মন্থন করে চাওয়া। এ জগতে সেই চাওয়াই শ্রেষ্ঠ চাওয়া। মন শুধু হাতই পাতে না মা, মনের মধ্যে বিচারও যে আছে। যার মনের যেমন বিচার তার কামনা তাই। আমি মনে করি, প্রত্যেকের বিচার-সিদ্ধ মনের কামনাই তাকে সুখী করতে পারে। সংসারের মায়ায় যে মুগ্ধ—যে এই মায়াকেই মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে তার সুখ সংসারে। সে সংসারী হোক। স্বামী যদি স্ত্রীর কামনার বস্তু হয়—তাকে স্বামী-গরবিনী হতে দাও। আসলে যা চাও—মন বুঝে চাও—আর যা পাও, মন-প্রাণ দিয়ে নাও।

গোঁসাইজী কথা বলিতে বলিতে থামিয়া যান। যেন তাঁহার কথার মালাটা হঠাৎ ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

তার হঠাৎই ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। প্রায়ই যায়

খাদের ভিতরকার কাটা-কয়লা বহিয়া আনার জন্ম ট্রলি থাকে। অমন কয়েকটা ট্রলি মোটা একটি তারের সহিত বাঁধা থাকে। চড়াইয়ে উঠিবার বা ঢালে নামিবার সময় খাদের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ট্রলির তার ছিঁড়িয়া গেলে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহা অবর্ণনীয়। কালো ঝুলের মত অন্ধকারের হাজারটা পর্দা ভূগর্ভকে আলোক-হীন এক বিপদসংকুল সুড়ঙ্গ করিয়া রাখে। সে সুড়ঙ্গের দীর্ঘতা কিছু কম নয়। কিন্তু তাহার প্রস্থ এবং উচ্চতা বিপজ্জনক। এমনি সুড়ঙ্গ পথে কয়েকটি কয়লা-বোঝাই ট্রলি উঠিতেছে—কিংবা খালি ট্রলি নামিতেছে হঠাৎ তার ছিঁড়িয়া গেল। এই হঠাতের পরবর্তী দৃশ্যটা কল্পনা করিতে শিহরিয়া উঠিতে হয়। তার-ছেঁড়া লোহার ভারী ট্রলিগুলা খাদের ঢালু পথে উল্কার মত সবেগে, সশব্দে নীচে নামিয়া আসিতে থাকে। কোথাও সামান্য বাধা পাইলে—অথবা একটা ট্রলি যদি লাইন হইতে নামিয়া যায় তাহা হইলেই হইল—ওই ভারী ভারী লোহার ট্রলিগুলা সবেগে এ ওর গায়ে ধাক্কা খাইয়া মুহূর্তে এক প্রলয় বাঁধাইয়া তুলিবে। এমনি প্রলয় মাঝে মাঝে বাঁধে। পথ চলতি মালকাট্টা ও বাবুর দল দুর্ঘটনার স্থানে থাকিলে কেহ প্রাণ হারায়—কেহ বা হাত-পা কাটা অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

তার ছিঁড়িয়া এই রকম একটা 'হলেজ এক্সিডেণ্ট' ঘটিয়াছিল। আর সেই দুর্ঘটনায় একটা কুলি নিমেষেই রক্ত-মাংসের একটা পিণ্ডে পরিণত হইল। ওভারসিয়ার মাথুরের মাথা ফাটিল; ডান হাতের হাড়টা বাহুবন্ধের কাছে টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। সূর্যশংকর একটুর জন্ম বাঁচিয়া গিয়াছে। গায়ে তাহার চোট লাগিলেও তেমন মারাত্মক জখম সে হয় নাই।

এক্সিডেণ্ট ঘটিয়াছিল বেলা নটা দশটা নাগাদ। খাদের উপরে

হতাহতদের যখন একে একে তোলা হইল তখন বেলা প্রায় একটা বাজে। খাদের মুখে ভিড়। কুলি, মালকাট্টা, মিস্ত্রী, মজুর, বাবুর দল, ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, ইঞ্জিনিয়ার সকলেই জড় হইয়াছে। কোলিয়ারীর নতুন ডাক্তার মজুমদার মৃত রক্তাক্ত পিণ্ডটার পানে চাহিয়া অর্ধস্ফুট স্বরে কী যেন একটা স্বগতোক্তি করিয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিবার মত ক্ষীণতম কৌতূহলও ওই মাংসপিণ্ডটার কোথাও ছিল না। তবু ডাক্তারের কর্তব্যমত মজুমদার মৃত কুলিটাকে একবার পরীক্ষা করিয়াছিল। পরীক্ষাশেষে ইঙ্গিতে তাহাকে সরাইয়া লইয়া যাইতে বলিয়াছে।

মাথুর অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। চোখের পলকে তাহাকে কয়েকটা ইন্‌জেক্‌সান দিয়া মজুমদার মাথুরকে কোলিয়ারীর ডিস্‌পেন্‌সারীতে লইয়া যাইতে আদেশ দেয়।

সূর্যশংকর নির্বাক নেত্রে সবই লক্ষ্য করিতেছিল। পায়ের যন্ত্রণাই শুধু নয়—মনের মধ্যে সে আশ্চর্য একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছে।

—কই, দেখি কোথায় লাগলো। মজুমদার সূর্যশংকরের প্রতি মনোযোগী হয়।

নিরুত্তরে পাটা দেখাইয়া দিয়া সূর্যশংকর কুলিগুলার দিকে তাকাইয়া থাকে। মৃত কুলিটাকে এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া কে যেন একটা চিট-নোঙরা কাপড়ের টুকরাতে দেহটাকে খানিকটা ঢাকিয়া দিয়াছে। উহাদের অস্পষ্ট কথাবার্তা হইতে একটি বিশেষ কাহিনী ক্রমশঃই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। আর সূর্যশংকর এক মনে তাহাই শুনিতেছে।

খাদে আসিবার আগে রামভরত তাহার আওরাতের সঙ্গে জোর ঝগড়া বাধাইয়া তুলিয়াছিল। সাথিয়া ঘুম চোখে চুলায় ভিজা কাঠ দেওয়ায় চুলা ধরে নাই; তাহার উপর না ছিল চা-পাত্তি; না লোটাতে

পানি। সকালে চাপাটি ও চা খাইয়া রামভরত খাদে যায়—দুপুরে বাড়ি ফেরে না—সেই সন্ধ্যায় বাড়ি আসে। যাওয়ার সময় মাথার পাগড়ীতে মোটা মোটা দু'তিন টুকরা রুটি, দু'চারিটি মির্চা, একটু লবণ, খানিকটা বা চাটনী বাঁধিয়া লইয়া যায়। দুপুরে উহাতেই ক্ষুধা নিবৃত্ত করে।

আজ সকালে ঠেলা দিয়া উঠাইয়া দিলেও চুলায় ভিজা কাঠ গুঁজিয়া দিয়া দাওয়ায় আসিয়া সাথিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সর্বাঙ্গ দিয়া মাটি আঁকড়াইয়া এমন মরণ ঘুম আর কোনদিন সে ঘুমায় না। অন্ততঃ রামভরত যতক্ষণ না খাদে যায়। সাথিয়া বেঁহুস হইয়া ঘুমাইতেছিল। তাহার চুলা যে নিভিয়া গিয়াছে—হাঁড়িতে পানি নাই, নদী হইতে জল আনিতে হইবে; রামভরতকে চাপাটি আর চায়ে তৈয়ারী করিয়া দিতে হইবে, তাহা সাথিয়ার খেয়াল ছিল না।

খেয়াল হইল তখন—যখন রামভরতের হ্যাঁচকা টানে চোখ মেলিয়া সাথিয়া দেখে, ফিকে সাদা ভোরের গায় উজ্জ্বল তামাটে রঙ ধরিয়াছে, মরচে-ধরা টিনের বেড়াটা দাওয়ায় হাল্কা ছায়া ফেলিয়া চুপিসারে তাহার গায়ের আলস্য নিজের গায়ে মাখিয়া লইতেছে।

নদী হইতে প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া, স্নান সারিয়া ফিরিতে রাম-ভরতের ঘণ্টাখানেকেরও বেশি সময় লাগে। তাহার পর তাড়াতাড়ি চাপাটি ও চা খাইয়া তাহাকে খাদে যাইতে হয়।

রামভরত ফিরিল, সাথিয়াকেও জাগাইল। কিন্তু চাপাটি, চা—? সাথিয়াকে গালাগাল দিতে দিতে রামভরত খানিকটা ছাতু চাহিল। ছাতু মাখার জল জুটিল না। হাণ্ডি, লোটা, কোথাও একটু জল নাই। সাথিয়াকে পিতারী মাতারী তুলিয়া যাচ্ছে-তাইভাবে গালিগালাজ সুরু করে রামভরত। সাথিয়ার শরীর ভালো নয়। তা ছাড়া মুখ বুজিয়া

কুৎসিত গালাগাল সহিয়া যাইবে, তেমন মেয়ে ওদের সমাজে বিরল। উভয় পক্ষের কলহটা যখন চরমে উঠিল তখন রামভরত সাথিয়াকে ধরিয়া পিটাইয়া দিয়া খাদে বাহির হইয়া আসিয়াছে।

আর সাথিয়া? ওই তো সাথিয়া—ছাউনী-তোলা খাদ-অফিসের একটু দূরে হরিতকী গাছগুলার তলায় পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে। চড়া রোদ মাথায় করিয়া এই গরমের দিনে প্রায় ক্রোশটাক পথ হাঁটিয়া আসার ক্লান্তি কি কম!

হরিতকী গাছের ছায়ায় বসিয়া বারবার মুখ ও গলার ঘাম মুছিতে মুছিতে সাথিয়া আঁচলের হাওয়া খায়। পাশে একটি জামবাটিতে রামভরতের জন্য চাপাটি ও অড়হর ডাল রাঁধিয়া আনিয়াছে। ঘিউ দেওয়া ডাল—রামভরত তারিফ করিয়া খাইবে। আর পাশেই এক লোটা ঠাণ্ডা পানি। আসিবার সময় সাথিয়া আবার কয়েকটা বিড়িও কিনিয়া আনিয়াছে—রামভরতকে দিয়া যাইবে।

হরিতকী গাছের তলায় বসিয়া সাথিয়া বিশ্রাম লয় আর ভাবে—খাদের মুখে এতো ভিড় কেন? কি যেন একটা ঘটিয়াছে! দূর হইতে স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না। কাছে যাইতেও সাথিয়ার সাহস হয় না। সাহেবেরা সকলেই সেখানে। চেনা-জানা মুখ চোখে পড়িতেছে। ওই তো বচন, গিরধারী, মাংলু—আরও যেন কে কে?

কয়লা বোঝাই করা টিবিটার কাছে কামিনগুলাও জোট পাকাইয়া দাঁড়িয়া থাকে। তাহাদেরও কাছে ঘেঁসিতে দেওয়া হয় নাই। ডাণ্ডা-হাতে শিবদয়াল সিং তাহাদের পথ রুখিয়াছে। সাথিয়া দূর হইতে স্পষ্ট দেখিতে পায় না, তবু তাহার মনে হয়—কয়লার গুঁড়া-মাখা কামিনগুলা কেমন যেন ভয়ে ভয়ে দাঁড়াইয়া আছে। রামভরত কই—রামভরত?

সূর্যশংকরের কয়েক হাত দূরে দাঁড়াইয়া কুলিরা রামভরত আর

সাথিয়ার কথাই বলাবলি করিতেছিল। সূর্যশংকরের কানে সেই কথাই ভাসিয়া আসিতেছে। বোধ করি—রামভরত আর সাথিয়ার কথা ভাবিয়াই সূর্যশংকরের মনটা ক্রমশঃই আশ্চর্য একটা অস্বস্তি ও বিমর্ষ চিন্তায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

পায়ের আঘাত পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার মজুমদার বলে,

—একটা ইন্‌জেক্‌সান দিয়ে দি, স্যার!

—দরকার হবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—আফ্‌টার অল্ ইন্‌জিউরী তো।

—বেশ দিন। কিন্তু মাথুর—সূর্যশংকর ইঞ্জিনিয়ার দোবের দিকে তাকায়। এ দৃষ্টির অর্থ—মাথুরকে এখনো কেন এখানে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে! দোবে বলে, স্ট্রেচার আনার জন্য লোক পাঠানো হইয়াছে। স্ট্রেচার আসিলেই মাথুরকে ডিস্‌পেন্‌সারীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

ডাক্তার মজুমদার ইন্‌জেক্‌সানের সিরিঞ্জ পরিষ্কার করিয়া লইতেছিল। সূর্যশংকর বলে, 'আমি অফিসে যাচ্ছি; আপনি আসুন।'

যে হরিতকী গাছগুলার তলায় সাথিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়াছিল, তাহার অনতিদূরেই কোলিয়ারীর অফিস। যাওয়ার পথে সূর্যশংকর আড়চোখে সাথিয়ার দিকে তাকায়। বড় সাহেবকে আসিতে দেখিয়া সাথিয়া পা গুটাইয়া লইয়াছিল। সূর্যশংকর কাছে আসিলে মাথার ঘোমটা আরও একটু টানিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লয়। আসিতে আসিতে সূর্যশংকর সাথিয়ার মুখের যেটুকু দেখিতে পায়—সেটুকু তাহার চিন্তাস্রোতের সাথে ভাসিয়া চলে। সহজ, সাধারণ এদেশীয় একটি মেয়ের মুখ। কোনই বৈশিষ্ট্য নাই। তথাপি এই মুখটি সূর্যশংকরের উদ্বেগের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। হতভাগ্য রামভরত যে আর ইহজীবনে তাহার ঘরবালীর

হাতে-সেঁকা চাপাটি খাইতে আসিবে না—এই কথাটি তাহার অপেক্ষমাণা স্ত্রীকে কেমন করিয়া জানানো যায়, তাহাই সমস্যা।

সমস্যা যতো কঠিন হউক তাহা এড়াইয়া যাইবার পথ সূর্যশংকরের ছিল না। কোলিয়ারীর ম্যানেজার হিসাবে তাহার দায়িত্বই সর্বাপেক্ষা বেশি। সব কিছুর জন্যই সে দায়ী। এতো বড় একটা দুর্ঘটনার সমস্ত দায় তাহাকে বহন করিতে হইবে। কতো যে লেখালেখি, ছুটাছুটি—তাহার আর ইয়ত্তা নাই। অবশ্য সবই যে এই মুহূর্তে, তাহা নয়। পরেও।

উপস্থিত যাহা করা উচিত, তাহাও একেবারে যৎসামান্য নয়। ইঞ্জিনিয়ার দোবেকে অফিস কামরায় ডাকাইয়া পাঠাইয়া সূর্যশংকরকে এখনই দুর্ঘটনা সম্পর্কীয় কাজকর্ম সারিতে হইবে। কিন্তু সর্বাগ্রে সাথিয়াকে কোন গতিকে এখান হইতে সরাইয়া ফেলা দরকার।

শেষ দুপুরে অফিস হইতে উঠিয়া সূর্যশংকর যায় ডিস্‌পেন্‌সারী। সেখানে মাথুরের তদারক সারিয়া উঠিতে উঠিতে বিকেল শেষ হইয়া আসে। মজুমদার বলিয়াছে, মাথুরকে টাউনের সিভিল হস্পিট্যালে পাঠাইতে হইবে। আজ রাত্রেই পাঠাইতে পারিলে ভালো হইত। কিন্তু এ জংলী জায়গার সবই অদ্ভুত। সারাদিনে আসার ট্রেন একটি, যাওয়ার ট্রেনও সেই এক। আসিতে হইলে সকাল, যাইতে হইলে বিকাল। আজ আর ট্রেন ধরা যাইবে না। প্রায় তিন মাইল পাহাড়ী পথ ভাঙিলে তবে স্টেসন। অতএব অপেক্ষা করা ছাড়া পথ নাই। মোটর করিয়া যাওয়া চলে—কিন্তু রাস্তাঘাট অত্যন্ত খারাপ। জার্কিং পড়িবে। মজুমদার তাহাতে রাজী নয়।

ডিস্‌পেন্‌সারী হইতে সূর্যশংকর সবে মাত্র উঠিয়াছে—এমন সময় ঘোড়ায় চড়িয়া ছয়-সাত মাইল দূরবর্তী থানা হইতে দারোগা আসিয়া হাজির।

চিঠি পাইয়া অ্যাক্‌সিডেন্টের তদারক করিতে আসিয়াছে। দারোগা ভদ্রলোক নাগপুরের লোক। বয়সে যুবক—এখনও গোঁফ ঘন হয় নাই; কাজে কাজেই পাকা দারোগা হইতে পারে নাই। বৃত্তান্ত শুনিয়া বলে, অযথা এ ছুটোছুটি ম্যানেজার সাহেব। কোলিয়ারীর আণ্ডারগ্রাউণ্ডে অ্যাক্‌সিডেণ্ট—লোক তো হামেশাই মারা যায়। এ নিয়ে আর কি এন্‌কোয়ারী পুলিশ থেকে আমরা করবো। ডাক্তারবাবুর ডেথ্‌ সার্টিফিকেট তো আছে, না! ঠিক আছে—লাস পুড়োতে পাঠিয়ে দিন।

দারোগাকে সাথে করিয়া সূর্যশংকরকে আবার অফিসে ফিরিতে হয়। পুরানো ইঞ্জিন-ঘরের শেডের তলায় রামভরতের দেহটা তেমনিভাবেই ঢাকা দেওয়া পড়িয়া আছে। একটু দূরে সহদেব সিং এবং আরও দু'-চার-জন কুলি গোল হইয়া বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছে। শব সংকারের সকল ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ। শুধু বড়সাহেব একটিবার মুখের কথা বলিলেই তাহারা লাস উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারে। দারোগা না আসা পর্যন্ত মৃতদেহ আজ পোড়ান হইবে কি না, সে বিষয়ে তাহাদের সন্দেহ ছিল। ব্রাহ্মণ মিশির আবার বলিয়াছে, অপঘাতে মৃত ব্যক্তিকে সূর্যাস্তের আগে না পুড়াইলে রামভরত প্রেতযোনি পাইবে। এই বিষয় লইয়াই এতোক্ষণ রামভরতের সহকর্মীদের মধ্যে জল্পনাকল্পনা চলিতেছিল।

রাম নাম স্যাত্‌ হ্যায়। রামভরতের মৃতদেহ লইয়া সহদেবরা চলিয়া যায়। সমবেত কণ্ঠস্বরের গুরু গম্ভীর একটা ধ্বনি পড়ন্ত বিকালের রৌদ্র-কিরণের ম্লান আভাকে যেন হঠাৎ আরো ম্লানতর করিয়া দেয়। ছোট, একটা ঘূর্ণি ইঞ্জিন-ঘরের নিকট হইতে একরাশ কয়লা উড়াইয়া লইয়া পাক খাইতে খাইতে আগাইয়া যায়—আর ঠিক সেই হরিতকী গাছগুলার গোড়ায় আসিয়া চক্রাকারে শূন্যে উঠিয়া আকাশে মিলাইয়া যায়। সকালে এইখানেই সাথিয়া বসিয়াছিল।

অপসৃয়মাণ মূর্তিগুলির দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে সূর্যশংকরের মাথাটা একটু নীচু হইয়া আসে ; বুক ঠেলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

জঙ্গলের আঁকাবাঁকা পথ ভাঙ্গিয়া সূর্যশংকর বাংলোয় ফিরিতেছিল। সূর্য প্রায় ডুবু-ডুবু। পশ্চিম দিগন্তের তামাটে রঙ ফিকা হইয়া আসিতেছে। দিনের শেষ আলোটুকু নিঃসাড়ে শুষিয়া লইয়া গাছ-গাছালির ফাঁকে ফাঁকে ক্রমশঃই অন্ধকার ঘন হইতে থাকে। অসংলগ্ন পদক্ষেপে সূর্যশংকর ফিরিয়া চলিয়াছে। সর্বাঙ্গ ভরিয়া অসহ্য ক্লান্তি। মনটাও তাহার ভাসা মেঘের মত ঘটনা হইতে ঘটনান্তরে ভাসিয়া রহিয়াছে। নীড় প্রত্যাগত পাখিদের পাখার ঝাপ্টা ও কলকাকলীতে মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া সূর্যশংকর পথ ঠাওর করে—; আবার আগাইয়া চলে।

কি যেন হইয়া গেল ? অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে তিনজন হাঁটিয়া চলিয়াছিল—হঠাৎ ক্ষিপ্ত প্রতিধ্বনিত একটা শব্দকে ভালো করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে না করিতেই সব কিছু লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়। মাথুর হয় তো বাঁচিবে—অঙ্গহীন হইয়া জীবন কাটাইবে। সূর্যশংকর নিজে বাঁচিয়া গিয়াছে। দোবে বলিতেছিল—ভাগ্য ; দৈব। তাহার যুক্তিতে একই ঘটনার মুখোমুখি হইয়া কেহ মরে, কেহ বাঁচে—একই অবস্থার মাঝে পড়িয়া কেহ হারে, কেহ জেতে। ইহাই ভাগ্য—অদৃষ্ট। অদৃষ্ট আর দৈব—এক রহস্য। কখনো কখনো তোমার অপ্রত্যাশিত স্বপ্নকে অবহেলায় তোমার হাতের মুঠায় তুলিয়া দেয়—আবার কখনো কখনো তোমার হাতের মুঠা হইতে শ্রেষ্ঠ রত্নটিকে ছিনাইয়া লইয়া নাগালের বাহিরে ফেলিয়া দেয়। একদিকে ইহার অপার করুণা, আশ্চর্য পক্ষপাতিত্ব—অপর দিকে যুক্তিহীন নির্মমতা, অমোঘ দণ্ড।

বেচারী রামভরত ! আজ প্রায় ছ'-সাত বছর হইতে চলিল সূর্যশংকর

মধ্যপ্রদেশের জঙ্গল ঘেরা এই কোলিয়ারীতে ম্যানেজারি করিতেছে। সাত বছর ধরিয়া নিত্য রামভরত সূর্যশংকরের সাথী। ম্যানেজার সাহেবের খাস পিয়ন বা চাকর। কর্মঠ, স্বাস্থ্যবান এই যুবকটিকে সূর্যশংকর স্নেহ করিত। একটু বোকা হইলেও রামভরতের কর্তব্যজ্ঞানের অভাব ছিল না। আর সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল তাহার টান। সাহেবের জন্যে রামভরতের অদ্ভুত একটা ভালোবাসা ছিলো। কেন যে, সূর্যশংকর তাহা জানে না।...আজ সারাদিন শত কাজের মাঝেও সূর্যশংকর বারবার শুধু রামভরতের কথাই ভাবে। খুঁটিনাটি কতো ঘটনাই তাহার মনে আসে আর যায়—মনটা ভারাক্রান্ত হইয়া থাকে।

সূর্যশংকর মুখ তোলে। সামনেই তাহার বাংলো দেখা যাইতেছে। বারান্দায় আলো। বেতের চেয়ারে বনলতা; অমর সামনে পায়চারি করিতেছে।

গেটের কাছাকাছি সবেমাত্র আসিয়া পৌছাইয়াছে—এমন সময় হঠাৎ অন্ধকারে ঝোপের আড়াল হইতে কি যেন ছুটিয়া আসিয়া সূর্যশংকরের পায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। আর একটু হইলেই সূর্যশংকর পড়িয়া যাইত। টাল সামলাইয়া পা ছাড়াইয়া লইবার জন্য সে পা ছোঁড়ে। পা তবু ছাড়ে না। সূর্যশংকর আবার চেষ্টা করে; নিষ্ফল হয়।

কি এটা? সূর্যশংকর ভালো করিয়া নজর করিবার চেষ্টা করে। না, কুকুর বা অন্য কোন পশু তো নয়। এ মানুষ। পিঠ-ভর্তি চুল ছড়ানো। মুখ নীচু। কে যেন দুই হাতে সূর্যশংকরের কঠিন বুট সমেত পা দুটি বুকের মধ্যে কঠিনভাবে সাপ্টাইয়া ধরিয়াছে। সূর্যশংকর শুধু বিস্মিতই হয় না—তাহার বুকটাও হঠাৎ কাঁপিয়া ওঠে।

—এই কোন্ হায়—? ছোড়ো—; ছোড়ো জল্‌দি! : পা ঝাঁকুনি দিয়া সূর্যশংকর নিজেকে মুক্ত করিতে চায়।

পায়ের কাছে যে মাংসপিণ্ডটা হাঁটু-বুক এক করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার কোনো সাড়া-শব্দ নাই। একটা ভারী পাথর যেন হঠাৎ সূর্যশংকরের পায়ে আসিয়া পড়িয়াছে।

সূর্যশংকর চীৎকার করিয়া ডাকে,

—অমর, ও অমর—এই যে গেটের কাছে। তাড়াতাড়ি একটা বাতি নিয়ে এসো।

অন্ধকারেই সূর্যশংকর হাত নামায়। নরম একটা বাহু তার মুষ্টিবদ্ধ হয়। মানুষটিকে পায়ের উপর হইতে উঠাইবার চেষ্টা করিয়া সূর্যশংকর আবার বলে,

—এই, কোন হ্যায়—উঠো তুরন্ত্।

সূর্যশংকরের পায়ের কাছে লুটানো মূর্তিটা অদ্ভুতভাবে গোঙাইয়া গোঙাইয়া কাঁদিতে থাকে।

টর্চ লইয়া অমর আসিয়া পৌছাইয়াছে—পিছনে বনলতা। টর্চের আলোয় সূর্যশংকর কোনোরকমে একটা পা ছাড়াইয়া লইয়া পদতলের মূর্তিটিকে খানিকটা তুলিয়া ধরে।

এতোক্ষণে মূর্তিটিকে চেনা যায়। সাথিয়া—রামভরতের স্ত্রী। আলোয় সাথিয়ার মুখের দিকে তাকাইয়া সূর্যশংকরের মত মানুষও শিহরিয়া ওঠে। কপাল কাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে—সারা মুখ ফোলা, গলা, বুক, হাতে অজস্র ক্ষতচিহ্ন। চুল খোলা। পিঠ, মাথা ছড়াইয়া চুলগুলি আলুথালু হইয়া রহিয়াছে।

—ধরো তো, অমর! ছাড়াতে পারছি না—!

অমর বনলতার হাতে টর্চ দিয়া সাথিয়াকে ধরিতে আসে। কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয় না। সাথিয়া এক ঝটকায় অমরকে দূরে ঠেলিয়া দেয়। অমর আবার আসে। এবার সাথিয়া তাহার হাতে জোর কামড় দেয়। হাত লইয়া অমর সরিয়া দাঁড়ায়; যন্ত্রণাবিকৃত শব্দ করিতে থাকে।

—তুমি পারবে না। বাহাদুরকে ডাকো।

অমর বাহাদুরকে ডাকিতে থাকে।

সূর্যশংকরের যে পা-টায় আঘাত লাগিয়াছিল, সাথিয়া এখন সেটাকেই আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। যন্ত্রণা বাড়িতে থাকে। ইচ্ছা করিলে সূর্যশংকর সাথিয়ার বুকে-পেটে জোর দু'টা লাথি মারিতে পারিত। নিজেকে মুক্ত করাও ইহাতে কঠিন হইবে না। এমন তো কতোই করিয়াছে সে। কিন্তু আজ আর পা যেন উঠিতে চায় না। পাথর হইয়া থাকে।

—আরে ছোড়ো না! চোট লাগা হ্যায় হামারি গোড়মে। দুখাতা হ্যায়। কুছ বোল্‌না হ্যায় তো বোলো! : সূর্যশংকর অসহায়ের মত বলে।

সাথিয়া কথা বলে না, কাঁদে। এবার আর গোঙানি নয়—ডুকরাইয়া কাঁদিতে থাকে।

বাহাদুর আসিলে সূর্যশংকর সাথিয়াকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিয়া তাহাকে ধরিতে বলে। বাহাদুর পিছন হইতে সাথিয়াকে বুকের মধ্যে জাপ্টাইয়া ধরিয়া টান দেয়। সাথিয়ার গায়ে অসুরের শক্তি আসিয়াছে। সহজে বাহাদুর তাহাকে হঠাইতে পারে না। দু'জনায় অনেকক্ষণ ধরিয়া টানাটানি চলে। ধস্তাধস্তিতে সাথিয়ার গায়ের শাড়ি খুলিয়া পড়ে; জামা ছেঁড়ে। অন্ধকারে এলোকেশী এক চামুণ্ডা মূর্তির ধক্‌ধকে চোখ দুটি জ্বলিতে থাকে। অবশেষে কোনোরকমে পায়ের উপর হইতে সাথিয়াকে সরাইয়া লইলে সূর্যশংকর একটু দূরে সরিয়া দাঁড়ায়।

সাথিয়া ডানা-কাটা পাখির মত ঝট্‌পট্ করে, আর বাহাদুরকে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল দেয়।

সূর্যশংকর বলে,

—বাহাদুর, উস্‌কো ঘর্‌মে বন্ধ্‌ কর্‌কে কুলুপ লাগা দেও। আর আর দেখো, প্যয়ছান্‌তা না রামভরতকো ডেরা। জল্‌দি যাও;

দো চার আদমি বোলাকে লে আও—বাদ ইয়ে পাগলীকে ঘর ভেজ্ঞ দেও।

নিজের ঘরে সাথিয়াকে তালা বন্ধ করিয়া বাহাদুর গেল লোক ডাকিতে। ওদিকে খোলা জানালা দিয়া সাথিয়ার তীব্র ক্রন্দন ও চীৎকার ভাসিয়া আসিতে থাকে—। পাগলই বটে—সাথিয়া পাগলের মতই অসংলগ্ন প্রলাপ বকে। স্বামীকে সে ফিরত লইতে আসিয়াছে। বড়সাহেব ইচ্ছা করিলেই স্বামীকে তাহার ফেরত দিতে পারে। তাহার স্বামী আর দোষ করিবে না। তাহারা এখান হইতে চলিয়া যাইবে। সাথিয়া আর কোনদিন সকালে ঘুমাইবে না। এবার সকাল সকাল ঘুম হইতে জাগিবে, চুলা ধরাইবে, চাপাটি সেঁকিবে, লোটায় জল রাখিবে। সাহেব—তোমার পায়ে পড়ি—আমার মরদটিকে ফিরাইয়া দাও। আমি তোমার ঝুটা পরিষ্কার করিয়া দিব, তোমার মদৎ করিব, তোমার রাণ্ডি হইব।

নিজের ঘরে বিছানায় চুপচাপ সূর্যশংকর শুইয়া শুইয়া সব শোনে। অমর বলে,

—শুনছো, সূর্যদা ?

—শুনছি ! : মৃদু স্বরে সূর্যশংকর জবাব দেয়।

—সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাবে নাকি ?

—যেতেও পারে।

—ট্র্যাজিক !

এক গ্লাস ওভাল্‌টিন্‌ লইয়া বনলতা ঘরে ঢোকে।

—একটু বেশি করেই করলাম, খেয়ে নাও। : বিছানার পাশে বসিয়া বনলতা সূর্যশংকরের হাতে গ্লাস তুলিয়া দেয়।

সূর্যশংকর বিনা আপত্তিতেই উঠিয়া বসে ; ওভাল্‌টিনে চুমুক দেয়। বনলতা সূর্যশংকরের চোট্‌-খাওয়া পায়ে হাত বুলাইতে থাকে।

—পা-টা বেশ ফুলেছে তোমার। জোরেই লেগেছে গো।

—হ্যাঁ, তা লেগেছে! দ্ব্যর্থবোধক স্বরে কথা বলে সূর্যশংকর।

ঘরের মধ্যে হঠাৎ পরিপূর্ণ নীরবতা নামিয়া আসে। সকলেই আত্মচিন্তায় মগ্ন। কেহ কাহারো চোখের দিকে পর্যন্ত তাকায় না। সাথিয়ার মর্মভেদী ক্রন্দনের তীব্রতাটাও হঠাৎ মন্থর হইয়াছে। দীর্ঘ করুণ খেদোক্তিগুলি থাকিয়া থাকিয়া জোয়ার আসা জলস্রোতের মত ঘরের তিনটি মানুষের মনের তট ভিজাইয়া দিয়া আবার সরিয়া যায়। বনলতা হঠাৎ বলে,

—মেয়েটার পোড়া কপাল! পেটের ছেলেটা এখন বাঁচলে হয়।

সূর্যশংকর ও অমর দু'জনাই সচকিত দৃষ্টিতে তাকায়।

—ছেলে? : সূর্যশংকরের চোখে অগাধ বিস্ময়।

—ওমা, ও তো অন্তঃস্বত্ত্বা!

—অন্তঃস্বত্ত্বা! তুমি কি করে জানলে?

—মেয়েদের চোখে এ জিনিসটা জানা এমন কিছু কঠিন নয়। বাহাদুর ওকে যখন তোমার পায়ের ওপর থেকে সারিয়ে নিলো তখনই দেখেছি। বেচারী!

যেন একটা হরিণী চোখের সামনে পালাইয়া জঙ্গলে লুকাইল—আর সূর্যশংকর তীব্র দৃষ্টিতে তাহারই অনুসরণ করিতেছে, এমনভাবেই সে তাকাইয়া থাকে। মনের একটা জট্ খুলিয়া গিয়াছে—ও, ভাবী জননী বুঝি বা এইজন্যই সকালে দাওয়ায় মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া পড়িয়া আলস্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। চুলা ধরাইতে পারে নাই, জল আনিতেও ভুলিয়া গিয়াছিল।

সাথিয়ার কৃত অপরাধের জন্য রামভরত তাহাকে বিলক্ষণ শাস্তি দিয়াছে—কঠিন শাস্তি। কিন্তু একটিবারও সে এই পরম বস্তুটির কথা কি

মনে করিয়াছিল? ভাবিলে হয় তো অমন অভিমান করিয়া চলিয়া যাইত না।

আর সে নিজে! নিজেকেও সূর্যশংকরের যথেষ্ট ভাগ্যবান ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। পায়ের কাছে মেয়েটা যেভাবে উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে সূর্যশংকরের বুট সমেত সবল লাথিটা অনায়াসে তাহার পেটে পড়িতে পারিত। অথচো পড়ে নাই। ভাগ্য; নেহাতই ভাগ্য। আঃ—সে বাঁচিয়া গিয়াছে—; বিরাট একটা অপরাধের ভার হইতে যেন মুক্তি পাওয়া গিয়াছে। সূর্যশংকর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

মনের ঝড়ও বুঝি থামে।

ঝড়ের দমকা হাওয়ায়, আচমকা আঘাতে যে জীর্ণ পত্রগুলি ভগ্নবৃন্ত হইয়াও ভূলুণ্ঠিত হয় নাই—এবার তাহাদের পালা। নিঃসহায় পাতাগুলি নিরিবিলি একে একে ঝরিয়া পড়ে। নিঃশব্দ মৃত্যু।

ঝরাপাতার জঞ্জাল ক্রমেই ভারী হয়।

এমনই মানুষের মন। নিরবচ্ছিন্ন একটা প্রাণস্রোত অলস গতিতে বহিয়া চলিয়াছিল; তার না ছিল কোন আকর্ষণ, না কোন উদ্দেশ্য। সনাতন, ধরাবাঁধা, মাপজোপ-করা কতকগুলি অভ্যাসের, বোধ এবং সংস্কারের ভেলায় ভাসিয়া পরম নিশ্চিন্তে আমরা বহিয়া যাই। হঠাৎ যখন ভেলা ভাঙ্গে, সংসাররূপী সমুদ্রের হাজারো ঢেউ অকস্মাৎ ফুঁসিয়া ওঠে, তখন শুধু চমকই লাগে না—কেবলমাত্র নিজেকে নিঃসহায়ই মনে হয় না, পরন্তু যে ভেলাকে কোনদিন বিচার করি নাই, তাহার ক্ষমতা-অক্ষমতা, ভালো-মন্দর খোঁজ করি নাই—শুধুমাত্র পাঁচজনের মুখের কথায় বিশ্বাস করিয়া আশ্রয় লইয়াছিলাম—, এবার তাহার সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠি। অবিশ্বাস, বিচার, বিশ্লেষণ, যুক্তি, ঘৃণা; একে একে তাহার হিসাব কষা সুরু হয়। আর সেই হিসাবমতই দেখি—বহুদিনের সঞ্চিত অনেক পুঁজিই এখন অসার, কাণা কড়িতেও তাহা বিকাইবে না। অতএব উহাকে আবর্জনার স্তূপে ফেলিয়া দাও। এমনি করিয়া তো মনের পাতা ঝরে, জঞ্জাল বাড়ে।

পিটার তো কবেই চলিয়া গিয়াছে।

হীরার দড়ির খাটিয়াটা শূন্য পড়িয়া থাকে। জ্বরের ঘোরে, বুকের যন্ত্রণায় আর কেহ করুণ কণ্ঠে বিলাপ বকে না। কেহ বলে না, 'কিসি ফিকির সে ইয়ে দরদ্ তো থোড়ি কমা দে বাঙ্গি, শালা নে কালিজা কটতা হায়।' একটু পরেই আবার ছটফট করিতে করিতে কেহ ডাকে না,

'তু আযা হীরা—। নাগিচ আযা—জহর কুছ্ হায় তো দে; পিলে হাম; মর্ যায়। গোর ভি মালুম ইত্নে তক্লিফ না দেগা।'

আহা, বেচারা পিটার সারাদিন, সমস্ত রাত কী কষ্টটাই না সহ্য করিয়াছে; ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়াছে। বারবার বিষ চাহিয়াছে। বিষ খাইয়া যন্ত্রণার হাত হইতে সে অব্যাহতি পাইতে পর্যন্ত রাজি ছিল।

অথচ হীরা তাহাকে বিষ দেয় নাই, জল দিয়াছে—মৃত্যু নয়; প্রাণ।

কেন? পিটার তাহার কে? কেন এই মমতা, এই শূশ্রূষা?

এই কি সেই হীরা—একদিন যে পিটারের বুকের উপর ভোজালি তুলিয়া তাহাকে ঝড়বৃষ্টিতে ঘরের বাহির করিয়া দিতে তিলমাত্র দ্বিধা বোধ করে নাই? কেন আজ তবে পিটারের ফেলিয়া-যাওয়া খাটিয়াটা শূন্য রাখিয়া নিজে মাটির দাওয়ায় আঁচল পাতিয়া শুইয়া থাকে? অদ্ভুত একটা দেশজ সংস্কারকে হীরা প্রাণপণে প্রশ্রয় দেয়? সে শুনিয়াছে, বেমারী লোকের শূন্য খাটিয়া অধিকার করা অশুভ। ইহাতে অসুস্থ ব্যক্তি নাকি আর বাঁচে না। যতদিন সে সুস্থ না হইতেছে ততদিন খাটিয়া শূন্যই থাকিবে। পিটারের শূন্য খাটিয়ায় মাঝে মাঝে হাত রাখিয়া হীরা যেন পিটারকে স্পর্শ করিতে চায়। বলিতে চায়,

—গার্ড সাহাব, আপনে নিদ যাইয়ে। ডর কিজিয়ে মত, দো চার দিনোমে আচ্ছা না হো যাইয়ে গা।

হীরাবাঈ মতিবাঈয়ের বোন। ও অঞ্চলের একজন কুখ্যাত বাঈজী ছিল এই মতিবাঈ। নাচে-গানে তেমন পারদর্শিতা কোনদিনই লাভ করিতে পারে নাই; দেহ-ব্যবসায়ে শুধু নাম কিনিয়াছিল। অক্লান্ত সঙ্গদান এবং বিকৃত যৌনাচারের হরেক রকম খোরাক যোগাইতে পারিত বলিয়াই তাহার আসর ছিল জম-জমাট। আর ছিল রূপ। সে রূপও টিঁকিল না; আসরের সব আলো নিভিল। সে কী অন্ধকার তখন!

তখনই না ওস্তাদ ইব্রাহিম মিয়া আসিয়াছিলেন। হীরাকে উপদেশ দিয়াছিলেন—বিল্লী বোলে তে লাট্ঠা……

এতদিন হীরা মনেপ্রাণে তাহাই মানিয়াছে। বিল্লীরা তো দলে দলে তাহার দুয়ারে আসিয়া ডাকাডাকি করিয়াছে—আর হীরা লাঠি দিয়াই তাহাদের দূরে তাড়াইয়া দিয়াছে। পেয়ারের কথা বলাই বাহুল্য। হীরা তাহার দিদিকে দেখিয়া বুঝিয়াছে পেয়ার আর সুরাত—প্রেম আর রূপ এই দুই-ই অসার। তবু রূপের কিছুটা মূল্য আছে; রূপ চিরকাল থাকে না বটে, যতদিন থাকে ততদিন প্রেমিকের অভাব ঘটে না। তা ছাড়া রূপের হাট জমাইতে পারিলে তো কথাই নাই—কুচ কাঞ্চনেই বিকায়। রূপের এ হেন বাস্তব মূল্যটা বুঝিতে বুদ্ধির প্রয়োজন ঘটে না। কুয়ায় জল থাকিলে তৃষ্ণার্তের দল যে চাতক পক্ষীর মত কুয়ার পাড়ে আসিয়া ভিড় জমাইবে, ইহা কে না জানে!

সাবধানী চতুর ব্যবসায়ী যেমন স্থায়ী মূলধন কখনই কারবারে খাটায় না, বহু বুদ্ধিমান মানুষ যেমন তাহার স্বল্প পুঁজির টাকায় হাত দিতে চায় না, অথচ পাঁচজনের কাছে তাহার সম্পদের সংবাদটা সাধারণ কতকগুলি সুবিধা আদায়ের জন্য গোপন রাখিতেও রাজী নয়, হীরা যেন তেমনি। রূপ লইয়া সে কারবার ফাঁদিবে না। কারণ রূপের কারবার চোরাবালির উপর প্রাসাদ গড়ার মতই। কিন্তু ভগবানের দেওয়া রূপকে সৌভাগ্যবশতঃ যখন দেহের কোঠায় বন্দী করিতে পারিয়াছে তখন সে দেহের শিখা জ্বলুক না, ক্ষতি কি। আসুক পতঙ্গ, আলিঙ্গন করিতে আসিয়া তাপ লাগিয়া তাহাদের পাখা পুড়ুক, জ্বলুক, মরুক। আজ পতঙ্গ পুড়িতেছে তাহাতে কি, তেল ফুরাইলে তো একদিন প্রদীপও নিজে নিভিত।

পুরুষকে নয়—পুরুষের লালসাকে হীরা বোধ হয় ঘৃণা করিত;

অবিশ্বাস করিত তাহার প্রেমকে। আজীবন যে শুধু পুরুষের দেহ-বুভুক্ষা ও সুবিধাবাদী শিকারী মনটার রূপ দেখিতে অভ্যস্ত, তাহার কাছে পুরুষ মানুষ একটা লোভী ইতর পশু ছাড়া আর কি-ই বা হইতে পারে। অন্ততঃ এতদিন তাহাই ছিল। তাহার রূপের আগুনে যাহাদের পাখা পুড়িয়াছে, তাহাদের জন্য হীরার কোনদিন এতটুকু দুঃখ হয় নাই। বরং মনে মনে খুশীই হইয়াছে। হীরার মনের এই মর্ষকামিতা স্বাভাবিক।

আকস্মিকভাবেই না ঝড় উঠিল ; দমকা হাওয়ায় মনপত্রের বৃন্ত ভাঙ্গিল।

এবার পাতা ঝরা।. সুরাত কি ঝুটা? ইব্রাহিম মিয়া কি ঠিক বলিয়াছে? সবই যদি ঝুটা, তবে কেন এই অস্বস্তি, করুণা, শূন্যতা? কেন পিটারও মিথ্যা হইয়া যায় না?

ইতিমধ্যে হীরা একদিন শহরের বড় হাসপাতালে যাইয়া পিটারকে দেখিয়া আসিয়াছে। জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য পিটার ঘোলাটে চোখ মেলিয়া হীরাকে একবার দেখিয়াছে। চিন্‌তে পারিয়াছে কি না, কে জানে। হয়তো পারে নাই।

হাসপাতালে ঢুকিয়া হীরার সে এক সমস্যা! দেখিব বলিলেই কি দেখা যায়। কে তুমি? বেশ-ভূষা, আলাপ-আচরণে তোমাকে বি. এন.-রেলের ক্লাশ টু গ্রেডের গার্ড মিঃ বি ডবলু পিটারের আত্মীয়া অথবা বান্ধবী বলিয়া তো মনে হয় না। তবে, দেখা করিতে চাও কেন?

কেন যে—সে কথা হাসপাতালের লোককে হীরা কি বুঝাইবে, নিজেও তো সে জানে না। তবু হীরা আমতা আমতা করিয়া যতটা পারিল, যাহা পারিল—পিটারের সহিত তাহার পরিচয়ের ইতিহাসটা এক মাদ্রাজী নার্সের কাছে বলে। সেই নার্সই আবার পিটারের সহিত দেখা করাইয়া দেয়।

রোগের বিবরণ আভাসে যাহা শুনিয়াছে, তাহাতে বিশেষ কিছু

হীরা বোঝে নাই। পিটারের বুকে জল জমিয়াছে। অসুখটা খারাপ; কি হইবে বলা যায় না। তবে সারিয়া উঠিলেও তাহা সময়সাপেক্ষ।

অনেক আশা করিয়া হীরা গিয়াছিল শহরের হাসপাতালে; আর ফিরিল ব্যর্থ মনোরথ, ব্যথাদীর্ণ, ক্লিষ্ট হৃদয়ে বিরাট এক শূন্যতার বোঝা বহিয়া।

হীরা সে কথাই ভাবে।

পিটার কি আজও জ্বরে অচৈতন্য? এখনো কি তাহার 'আঁখের হলদি' মুছিয়া যায় নাই? হীরার কথা গার্ড সাহেবের মনে আছে—না, ভুলিয়া গিয়াছে? হীরা যে হাসপাতালে গিয়াছিল, পিটার কি তাহা জানিবে?

লছমি, এ লছমি? : বাহিরে আসিয়া হীরা ডাক দেয়।

ভাঙ্গা মালগাড়ির ছায়ায় বসিয়া লছমি শিবলালের বাঁশি শুনিতেছিল। ডাকটা তাহার কাণে যায় নাই।

চালার বাঁশের আড়ে একটা হাত দিয়া হীরা ঝুঁকিয়া দাঁড়ায়। দেহটা তাহার বাঁকা ধনুকের মত বেঁকিয়া থাকে। একদৃষ্টে শিবলাল আর লছমীর পানে তাকাইয়া থাকে হীরা।

শিবলাল বাঁশের বাঁশিতে দেহাতি মেঠো একটা সুর প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। স্তব্ধ, নির্জন, হলুদ-দুপুরের সমস্ত আলস্য যেন বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে মুখ বুজিয়া বসিয়াছিল—শিবলাল এতক্ষণে তাহা মুখর করিয়া বাতাসে ছড়াইয়া দিয়াছে।

স্টেসনের কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় কে যেন আসিয়া দাঁড়ায়। কে—? মাস্টারবাবু না? হ্যাঁ—তিনিই তো। শিবলালকে ডাকিতেছেন বোধ হয়।

হীরা নামিয়া আসে। শিবলালের প্রায় কাছাকাছি আসিতেই হীরার মূর্তিটা শিবলালের চোখে পড়ে। ঠোঁট হইতে বাঁশি খসিয়া পড়ে লছমীও পিছনে তাকায়।

—মাস্টারবাবুনে বোলাতা হ্যায়, লালাজী। যাও না—: হীরা মৃদু হাসে। শিবলালের নামের শেষঅংশটুকু লইয়া তাহার এ পরিহাস আজ নূতন নয়।

শিবলাল একবার স্টেসনের দিকে তাকাইয়া তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। বাঁশিটা হীরার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলে,

—তু রাখ না দে, শাড়ওআইন!

হীরা কিছু বলিবার আগেই শিবলাল জোর কদমে আগাইয়া যায়। হীরা অবাক। ছোঁড়াটার সাহস দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছে। হীরাকে বেমালুম শালী বলিয়া ডাকিল, তাহার হাতে বাঁশি গুঁজিয়া দিয়া দিব্যি চলিয়া গেল। তামাশাটা তো মন্দ নয়।

এদিকে হীরার আকস্মিক আর্বিভাবে লছমীর প্রথমটায় মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। শিবলালের শালী সম্বোধনে মেয়েটা খিল খিল করিয়া হাসিয়া ওঠে।

—তু হাস্‌তি হ্যায় ছোঁড়ি? : হীরা ভ্রূকুটি করে।

—কিয়া বোলে—: লছমী কথা শেষ না করিয়াই আবার হাসে।

—বোলে তো কিয়া—? ম্যয় উ বেশরমকি শাড়ওআইন বন্ গিয়া! হীরা সরস স্বরে বলে, লালাজী নে তো তেরি দিল বিগাড়তা হ্যায়—আগর হাম শাড়ওআইন না ব্যনে তো ব্যনে কিয়া?

হীরা এবার নিজেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠে।

হাসি থামিলে বাঁশিটা পরখ করিয়া দেখিতে দেখিতে হীরা তাহা নিজের ঠোঁটেই ঠেকায়। ফুঁ দেয়। একবার—দু'বার—কয়েকবারই। মোটা, মিহি, ভোঁতা, ভাঙ্গা কয়েকটি স্বর ওঠে আর মিলায়।

হীরা আবার হাসে।

অনেকদিন পরে লছমী হীরাকে হাসিতে দেখিয়া বেশ একটু অবাক

হয়। বিশেষতঃ শিবলালের সহিত নিরিবিলি বসিয়া বাঁশি শোনার অপরাধটা হীরা এমনভাবে উপেক্ষা করিবে, লছমী তাহা ভাবে নাই।

হীরা ফেরে।

—শাহর যাগি, লছমি ?

—শাহর ? ক'ব্ ?

—এতওয়ার রোজ।

—হ্যাঁ, হ্যাঁও।

—যাগি তো বোল্ ; তালাও না পাও।

—তালাও।

হীরা হঠাৎ থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে।

—কিয়া ?

—তালাও !

হীরার মুখে আবার সেই ভাবান্তর। অন্ধকার ঘরে কেহ যেন হঠাৎ একটা বাতি জ্বালাইয়া দিয়াছে।

মনে মনে হীরার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে : তালাও যখন তখন তো মিলিয়া গিয়াছে। এবার পিটারকে সে নিশ্চয় সুস্থ দেখিতে পাইবে।

দেখা মিলিবে আর এক বাঁশরীওয়ালার। এবার আর হীরা শূন্যমনে ফিরিয়া আসিবে না !

সুধাকর ফিরিয়া আসিয়াছে।

একরাশ কচি কাঁঠাল পাতা সংগ্রহ করিয়া গোঁসাইজী এইমাত্র বাড়ি ফিরিলেন। ছায়ায় বসিয়া গামছা দিয়া বাতাস খাইতে খাইতে ডাক দেন,

—কুসুম, ও কুসুম !

রান্নাঘর হইতে উঁকি দিয়া কুসুম জবাব দেয়—'আসি'।

পাখা হাতে কুসুম কাছে আসিলে গোঁসাইজী হাসিয়া বলেন,

—শুনেছিস, সুধা ফিরেছে। পথে মতিলালের সংগে দেখা। বললে, সুধা নাকি আর এ বাড়ি আসবে না! ভিন্ন থাকবে।

কুসুম নীরবে পাখার হাওয়া করিতে করিতে কথাগুলি শোনে। গোঁসাইজী আবার বলেন,

—ব্যাটার আমার গোঁ কি কম! আসলে কি জানিস, বাবুকে এখন একটু সাধ্যি-সাধনা করতে হবে, তবে তিনি বাড়ি আসবেন।

কুসুম এবারেও কোনো জবাব দেয় না।

কাঁঠাল পাতাগুলি ছিঁড়িয়া বাছিয়া এক পাশে রাখিতে রাখিতে গোঁসাইজী বলেন,

—এ দুপুরে আর নয়; বিকেলে যাবো ওদিকে।

ওদিকের অর্থ যে সুধাকরের খোঁজে কুসুম তাহা বুঝিতে পারে। বলে,

—আপনি কেন যাবেন? গরজ থাকলে নিজেই আসবে।

—পাগল! ওর পক্ষ থেকে গরজের জন্যে আমি বসে থাকবো? আমার গরজে আমি যাবো। আ-আ—আয় হরিণী।

দাওয়ার একপাশে ছায়ায় হরিণী তাহার অলস দেহটা কুণ্ডলী পাকাইয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল। কচি কাঁঠাল পাতার গন্ধে বোধ হয় তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। হরিণী চতুষ্পদ প্রাণী—; আহারের আয়োজনটা ধারণা করিয়া লইতে তাহার এক মুহূর্তও বিলম্ব হয় না। গোঁসাইজীর কাছে আসিয়া মুখ উঁচু করিয়া দাঁড়ায়। পরম স্নেহে হরিণীর গায়ে গলায় মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে গোঁসাইজী তাহাকে কাঁঠাল পাতা খাওয়াইতে থাকেন।

—একটা অবোধ বোবা প্রাণী; সেও আদর করে ডাকলে কাছে আসে, আর মানুষ আসবে না! তাই কি হয়? : গোঁসাইজী বলেন।

কুসুম কোন উত্তর দেয় না। মনে ভাবে: আদর করে ছাগলকে ডাকা যায় কিন্তু যে মানুষ পাগল তাকে কি আদর করে ডাকা যায় নাকি!

ডাকিতে হয় না; সুধাকর নিজেই আসে।

তখন দুপুর। লু বহিতেছে। একটানা সোঁ সোঁ একটা শব্দ। ঠাকুরঘরের ঠাণ্ডা মেঝেতে গোঁসাইজী ঘুমাইয়া রহিয়াছেন।

পা টিপিয়া টিপিয়া অতি সন্তর্পণে সুধাকর এ ঘর ও ঘর সব দেখিয়া লয়। কুসুমের ঘরে আসিয়া দরজা ঠেলে।

কুসুম ঘুমায় নাই, তন্দ্রা ও চিন্তার আবর্তে চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসে। গায়ের কাপড়টা ঠিক করিয়া লয়। খিল খোলে। ঘরে পা দিয়াই সুধাকর আবার দরজাটা বন্ধ করিয়া দেয়।

কুসুম তাকায়, সুধাকরও।

কুসুম উদ্বিগ্ন হয়: এই ক'দিনে সুধাকরের চোখ মুখের কী শ্রীই না হইয়াছে। মাথায় একগাদা রুক্ষ চুল, মুখময় দাড়ি; গাল বসিয়া গিয়াছে—গলার কণ্ঠা দেখা দিয়াছে, চোখের কোলে কালি; বেশভূষা নোংরা।

সুধাকর দেখে কুসুমের কালো মুখ তেমনই পুরন্ত। আগের মতই নির্ভাজ কণ্ঠ। এ ক'দিনের অবর্তমানে কুসুমের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সুধাকর যদি চিরকালের জন্যও গৃহত্যাগ করিত, তবু বোধ হয় কুসুমের পুরন্ত মুখ ও উঠন্ত বুকে কোথাও দাগ বসিত না।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সুধাকর ঘর দেখিতে থাকে। ঠিক আগের মতই—পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, নির্জন, নিস্তব্ধ।

—আমার বাক্সটা ক-ই? সুধাকর প্রশ্ন করে।

চোখের ইঙ্গিতে বাক্সটা দেখাইয়া দিয়া কুসুম বলে, খাওয়া হয় নি?

—না। : সুধাকর তাহার বাক্সটা টানিয়া বাহির করে।

—স্নানও করো নি নিশ্চয়ই।

—না। জ্বর হয়েছে।

কুসুমের চোখের পাতা কুঁচ্‌কাইয়া আসে। সুধাকরের দিকে আগাইয়া যায়; বলে, কই দেখি, গা দেখি।

—থাক্। সোহাগে কাজ নেই, আমার বিছানা দাও।

কুসুম হাত বাড়াইয়াছিল। সুধাকরের গায়ের উত্তাপ আর দেখা হইল না; তাহার কণ্ঠের উত্তাপেই কুসুম হাত নামাইয়া লইল।

—ওই সতরঞ্চিটা আমার, দাও—ওটা দাও; তোষোক চাই না—চাদর দাও; দেশ থেকে যেটা এনেছিলাম—; আর বালিশ— : সুধাকর বিছানার দিকে চোখ রাখিয়া বলে।

—কি হবে বিছানা? : কুসুম এবার সত্য সত্যই অবাক মানে।

—আমার চিতেয় লাগবে।

কুসুম স্তব্ধ। নিষ্পলক চোখে সুধাকরের উগ্র মূর্তিটার দিকে তাকাইয়া ও ভাবে : লোকটা কি বাস্তবিকই ক্ষেপিয়া গিয়াছে নাকি!

—সঙের মত দাঁড়িয়ে আছো কেনো? কথাটা কি কানে ঢুকলো না?

—যা নেবার তুমি নিজেই নাও। চাদর আমার বাক্সে। এই নাও চাবি— : আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া কুসুম সুধাকরের পায়ের কাছে ফেলিয়া দেয়।

সুধাকর হ্যাঁচ্‌কা টান মারিয়া সতরঞ্চি বাহির করে—পাতা বিছানা তালগোল পাকাইয়া কাত হইয়া থাকে। বালিশ উঠাইয়া মেঝের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া সুধাকর বাক্স খুলিতে বসে। চাদর বাহির করিতে গিয়া—প্রথমেই বাহির হয় একটা বাঁশের বাঁশি। বাঁশিটা ভালো করিয়া দেখিতে

দেখিতে সুধাকর এক লহমার জন্য কুসুমের মুখের দিকে তাকায়। ক্রমেই তাহার চোখে-মুখে বিকৃত কুৎসিত হাসি ফুটিয়া উঠে।

—কোন্ নাগরের ধন—অ্যাঁ—বলি এতো যত্ন ক্যানে এতে?

কুসুম যেন পাথর। একটি কথাও তাহার মুখে নাই।

বাঁশিটা ফেলিয়া দিয়া সুধাকর চাদর বাহির করে।

নিজের বিছানাটা গুটাইয়া লইতে লইতে সুধাকর বলে,

—তোমার ঠাকুররে বলে দিও, আমি ভিন্ন থাকবো। আমার ভিন্ন পাত, ভিন্ন খাট। এ সংসারের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই!

তোরঙ্গটা টানিয়া সুধাকর হাতে ঝুলায়; বিছানাটা বগলে। কুসুম পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুধাকরকেও বাধ্য হইয়া দাঁড়াইতে হয়। কুসুম নীচু গলায় বলে,

—যাও কোথায়?

—যমের বাড়ি। তুমি রূপের ধুচুনী নিয়ে কেলে কেষ্ট ঠাকুরের তপস্যা করো, আর আমি ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ঘুরি। বয়েই গেছে আমার। ভিন্ন থাকবো, খাবো-দাবো, মেয়েমানুষ নিয়ে রাত কাটাবো—কিসের পরোয়া আমার। পুরুষ মানষের আবার অভাব—

কুসুম পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়ায়—সুধাকর যেমন ঝড়ের মত হঠাৎ আসিয়াছিল, তেমনি হঠাৎই চলিয়া যায়।

দাওয়ায় আসিয়া কুসুম দেখে—প্রখর রৌদ্রের মাঝে ধূলাবালি-ওড়া পথ দিয়া সুধাকর হনহন করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। কুসুম দেখে—আর বুকটা ক্রমেই ভারী হইয়া উঠে। চোখের মণিতে জল জমিয়া দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসিলে কুসুম চোখ ফিরাইয়া লয়।

সেইদিনই সন্ধ্যা বেলায় গোঁসাইজী দাওয়ায় নিজের হাতে মাদুর পাতিয়া ডাকিলেন,

—কুসুম, এদিকে আয়।

কুসুম কাছে আসিলে গোঁসাইজী বলিলেন,

—বোস, তোর সঙ্গে কথা আছে।

কুসুম বসিল। গোঁসাইজী প্রশ্ন করিলেন,

—সুধা এসেছিলো, কই তুই তো আমায় বলিস নি? মতিলালদের বাসায় গিয়ে শুনলাম, সুধা তার বাক্স-বিছানা নিয়ে গেছে।

এ কথার কি উত্তর দিতে পারে! সুধাকরের আকস্মিক আবির্ভাব ও অপসরণ এতোই গ্লানিময় যে, সে কথা গোঁসাইজীকে বলিতে কুসুমের বাধিয়াছে। পেটের একমাত্র সন্তানের ভিন্ন হইয়া যাইবার শাসানি পিতাকে শুনানো খুব শ্রুতিমধুর নয়। তাহা ছাড়া এই যে গণ্ডগোল—এই সবই তো কুসুমকে কেন্দ্র করিয়া। কুসুম না থাকিলে সুধাকর কি কখনো এমন করিতে পারিত, না ঐভাবে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পরিবার ও পরমপূজ্য দেবতাকেও গালিগালাজ করিতে পারিত। যখন মানুষ নিজেকে কোনো এক বিপর্যয়ের কারণ বলিয়া বুঝিতে পারে, তখন তাহার পক্ষে নীরব থাকা ছাড়া গত্যন্তর কি!

—কি, কথা বল্‌ছিস না যে—! : গোঁসাইজী আবার প্রশ্ন করেন।

—আপনার সাথে দেখা হয়েছে?

—না। বোধ হয় ইচ্ছে করেই দেখা করে নি। মতিলাল ব'ললে, সুধার যা বলার তোকেই নাকি বলে গেছে।

—বলেছে। : কুসুম সংক্ষিপ্ত জবাবে আলোচনাটা বন্ধ করিতে চায়।

—কি ব'লেছে রে?

কুসুম এবারও মুখ খুলিতে চায় না। গোঁসাইজী একটু অপেক্ষা করিয়া বলেন,

—লজ্জা পাস কেনো? দ্বিধা করিস না—যা ব'লেছে আমায় বল্। মন পুড়িয়ে মুখ বুজে থাকা ভালো নয়। তাতে অশান্তি বাড়বে বৈ কমবে না।

—এ বাড়ির সঙ্গে ওর আর কোনো সম্বন্ধ নেই। : কুসুম মাটিতে চোখ রাখিয়া মৃদু স্বরে বলিতে থাকে, ভিন্ন থাকবে ও, ভিন্ন হাঁড়িতে খাবে। যাতে মন লাগে, তাই নিয়ে থাকবে।

গোঁসাইজী মনোযোগ সহকারে প্রতিটি কথা শোনেন। চট্ করিয়া কোন জবাব দেন না, অন্ধকার শূন্যের দিকে তাকাইয়া অনেকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকেন। পরে সহসা একসময় বলিয়া ওঠেন,

—চৈতন্যমঙ্গল পড়েছিস, কুসুম! পড়িস নি,–না! সুন্দর কাব্য. অনেকদিন আগে তোর মাকে আমি চৈতন্যমঙ্গলের একটা শ্লোকের অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছিলাম—আজ তোকেও বুঝিয়ে দি—

সম্পদ বিপদ যত সব কর্মফল।
আন গাছে নাহি লাগে আনের বাকল॥
এক তরু হৈতে ভিন ফল নাহি ধরে।
আন তরু আন ফল ধরিতে না পারে॥

কর্মফলের অনুরূপ ফলই সংসারে মানুষ পায়। কু-কর্ম সুফল হরণ করে, আবার সদ্-কর্ম সুফল উৎপন্ন করে। সম্পদ অর্থ এখানে বিত্ত নয়, কেন না, কু-কর্ম দ্বারাও মানুষ অনেক সময় সম্পদ আহরণ ক'রতে পারে। সম্পদ অর্থে বুঝতে হবে সুসময়, বৈভব।···বুঝলি কুসুম? এক গাছের বাকল যেমন অন্য গাছে লাগে না—পেয়ারা গাছের বাকল কি নিম গাছে লাগানো চলে—না, কাঁঠাল গাছে ফলে নিম ফল? যে গাছের যা ধর্ম—সেই গাছে সেই ফলই ফলবে। যা আমার স্বভাব, যেমনটি আমার কর্ম—ঠিক তেমনটি ফলই আমি পাবো। এর ব্যতিক্রম হয় না; হ'তে পারে না।

আমি হাঁটবো উত্তরদিকে মুখ করে, আর মনে মনে চাইবো দক্ষিণমুখো বাসা, তাই কি হয়? অসম্ভব। তোর মা—এ কথা বোঝে নি, অনেকবার বোঝাবার চেষ্টা করেছি—কিছুতেই তার ভুল শুধরোতে পারি নি। সুধাকরকে আমি দোষ দিই না—। তোকেও বলি—কুসুম, এখনো সময় আছে, ভেবে দেখ্।

কুসুম আর কত ভাবিবে! এতো দু' এক দিনের কথা নয়। আজ ক্রমাগত তিন বৎসর হইতে কুসুম এই একই কথা ভাবিয়া চলিয়াছে। তবু প্রথম প্রথম সুধাকর মোটেই এমন ছিলো না—তখন তাহার ভয়-ডর ছিলো; ঠাকুর-দেবতায় মান্যি ছিল; ছিল গোঁসাইজীর উপর অসীম শ্রদ্ধা। ঠাট্টা, তামাশা, মান, অভিমান—এই সবের মধ্য দিয়া তাহাদের দু'টি জীবন স্রোতের ফুলের মত একই সাথে পাশাপাশি ভাসিয়া চলিয়াছে। সুধাকর তাহার মাথার ঘোমটা খসাইয়াছে, চিবুক ধরিয়া সোহাগ জানাইয়াছে, কখনো কখনো রাত্রে তাহার মুখে রসকলি আঁকিয়া দিয়া মুগ্ধ নেত্রে তাকাইয়া বিবশ গলায় বলিয়াছে—'তুই কি সুন্দর রে, কুস্মি!' তাহার পর নীচু গলায় গান ধরিয়াছে—'প্রেম ঢল ঢল ঈষৎ হাস, শ্যামমোহিনী সাজে রে। কুটিল কুন্তলে কবরী রাজ, রতন জড়িত খোঁপার সাজ……'

শ্যামমোহিনী—? ঠিক, তখন কুসুম শ্যামমোহিনীই ছিল বটে। কিন্তু তারপর যতোই দিন যাইতে লাগিল, সুধাকর বুঝিতে পারিল, নিজেকে বুভুক্ষু রাখিয়া তাহার মোহিনীকে শ্যামের নামে উৎসর্গ করা অর্থহীন। এ কি? কুসুম তাহার স্ত্রী—; তাহার জীবনসাথী—লীলাসঙ্গিনী, শয্যামিত্র। শ্যাম কে? কেনোই বা এ বিড়ম্বনা। কুসুমের আঘ্রাণ, তাহার শোভা একা সুধাকরই উপভোগ করিবে। সেখানে শ্যাম মিথ্যা, শ্যাম বাধা, শ্যাম শত্রু।

সুধাকরের চোখের মুগ্ধ দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে মৃত্তিকার দাবী নামিয়া আসে। সুধাকর হাত বাড়ায়। কুসুম সে হাত ঠেলিয়া দেয়।

যে হাত অধিকার করার জন্য আগাইয়া আসিয়াছে, তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেই কি বিপদ কাটে? যাহার হাত, সে সরে না—যে হাত সরাইয়া বাঁচিতে চায়,সে নিজেও সরে না।

তাই এতো উদ্বেগ, এতো অশ্রু, এতো ভাবনা!

গোঁসাইজী কি বলিতে চান? কুসুম কি আন গাছ—?

শ্যাম বৃক্ষের বাকল কি তাহাতে লাগিবে না!

কুসুম সারা রাত ছটফট করে। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখে: নীলকণ্ঠরূপী শ্যাম—আর শ্যামের গলায় বেড় দিয়া একটা সাপ নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে।

ঠাকুর, এ কি করলে! এ যে পাপ! আমায় বাঁচাও—!

কুসুমের চিবুক প্লাবিত করিয়া চোখের জলের নদী বয়।

নদীই; তবে পাহাড়ী। নাম, ঘাঘরী। বাংলায় যাহার অর্থ হইল ঘাঘরা। ঘাঘরাই বটে। বিশাল পাহাড়টার ঠিক কোনখান হইতে নদীটা উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহা কেহ দেখে নাই, জানেও না। তবে অনেক নীচে—একটি পাহাড়ী ঝরণার ধারাস্রোতে ধনী হইয়া ঘাঘরীকে লীলাচঞ্চলা হইতে দেখা গিয়াছে। ইহার পর ক্রমশঃই ঘাঘরী রূপ বদলাইয়াছে। যতোই নীচে নামিয়াছে, ততোই তাহার প্রস্থবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে পর্বতগাত্রকে বেড় দেওয়ার পরিধিও বাড়িয়া গিয়াছে; আঁকাবাঁকা গতিটাও হইয়াছে দ্রুত।

নদী হইলেও গ্রীষ্মকালে ঘাঘরীকে চেনা যায় না। সমস্ত নদীটাকে মনে হয় যেনো বালুশয্যা। যতদূর দৃষ্টি যায়—বালির একটানা একটা আঁকাবাঁকা সর্পিল গতি; উজ্জ্বল। তবে একেবারে নিঃস্ব হইলে এখানকার

জীবগুলিকে মরিতে হইত। ঘাঘরী তাই একেবারে নিঃস্ব নয়; শীর্ণ একটা জলধারা প্রায় সর্বত্রই চোখে পড়ে; কোথাও কোথাও বা জল একটু বেশি।

পদ্ম প্রথমটায় আপত্তি করিয়াছিল। বলিয়াছিল,

—মরা নদীতে মরতে যাবো নাকি? না বাপু, তার চেয়ে এখানেই ভালো—

—এখানে ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড কই? আপনার ওই জাফরীকরা-কাঠ দিয়ে ঢাকা বারান্দা—আর লাউ-কুমড়োর বাগানে ফটো তোলা। আমি ওতে নেই। বাজে ছবি হবে, তারপরে আমায় দুষবেন। : অমর আপত্তি তুলিয়াছিল।

—গরীবের এই ভালো।

—ফটোগ্রাফারের কাছে এটা খুবই মন্দ; না কি হেমন্তদা—আপনিই বলুন।

—তা ঠিক: হেমন্তবাবু আলনা হইতে কোট নামাইয়া পদ্মর দিকে তাকান, যেখানে যা মানায়। আমি যদি এখন এই রেলের গলাবন্ধ কোটটা গায়ে চড়িয়ে টিনের চেয়ার টেনে বারান্দায় বসি—ঠিক মানাবে। একেবারে রেলবাবুর মত ফটো হবে।

হেমন্তবাবু হাসেন। অমরও।

—নদীতেই বা কি আহা মরি রূপ আছে! শুধু বালি আর বালি। অমর ও হেমন্তবাবুর হাতে চায়ের কাপ বাড়াইয়া দিয়া পদ্ম ঠোঁট উল্টায়।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়া অমর বলে,

—ওটি বলবেন না বৌদি। ঘাঘরীর যদি রূপ না থাকে, তা হ'লে আমি যেন অন্ধ হয়ে যাই। : অমর এমনভাবে কথাটা বলে যে, সকলে একসাথে সশব্দে হাসিয়া উঠে।

হাসি থামিলে অমর আবার বলে,

—নদীর নামটি বড় মিষ্টি। রূপ মিলিয়ে, স্বভাব মিলিয়ে এমন নাম কে রেখেছিলো, জানি না। যেই রাখুক, লোকটা কবি ছিল। জানেন, হেমন্তদা—আমাদের দেশের এই নদী পাহাড়গুলোর নামকরণ বেশির ভাগই এমনি সুন্দর। এই যে ঘাঘরী, কি মন্দ নাম? পাহাড়কে যদি মেয়ে বলে ভাবা যায়—তা হ'লে এ নদী তার ঘাঘ্‌রাই; পাকে পাকে ছন্দ বেঁধে পাহাড়ের পা পর্যন্ত নেমে এসেছে।

—কবিতা, ছন্দ, ঘাঘ্‌রা—এসব আমি কিছু বুঝি না ভায়া—: হেমন্তবাবু গোঁফ মুছিতে মুছিতে হাসেন, 'তবে মেয়ে সুন্দর হ'লে তার ঘাঘ্‌রাটাও যে সুন্দর দেখাবে, তাতে আর সন্দেহ কি!

অমর সশব্দে হাসিয়া উঠে; পদ্ম ভ্রূকুঞ্চিত করে।

—লাখ কথার এক কথা বলেছেন। এক্‌জ্যাক্‌ট্‌লি তাই। পাহাড়টাই সুন্দর, তাই নদীটাও সুন্দর। নদীতে বালি থাকতে পারে, কিন্তু নদীর পাড় সেই—'কানন-কণ্ঠলগ্না নদীর মনোহর ভঙ্গিমা'।

হেমন্তবাবু উঠেন। কোটটা আর গায়ে দেন না, হাতেই রাখেন। বলেন,

—আমি চলি; ক'দিন থাকবো না। অফিসের কয়েকটা কাগজপত্র ঠিক করে রাখি গে যাই। : পদ্মকে উদ্দেশ করিয়া আবার বলেন, তুমি তো বহুকাল বাড়ির বাইরে বের হও না। যাও না—একটু বেড়িয়েই এসো নদীর ধার থেকে।

—অতো রাস্তা আমি মেয়ে ট্যাঁকে করে যেতে পারবো না, বাপু।

—মেয়ে নিয়ে যাবে কেনো? ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। স্টেসনে বেশ খেলা করে।

হেমন্তবাবু চলিয়া যান। অমর একটা সিগারেট ধরাইয়া বলে,

—যেতে হলে কিন্তু দেরি করলে চলবে না। রোদ একেবারে পড়ে গেলে ফটো তুলতে পারবো না। একটু তাড়াতাড়ি নিন।

বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় অমর প্রশ্ন করিল,

—তখন হেমন্তদা কয়েকদিন থাকবেন না বললেন। আপনারা কোথাও যাচ্ছেন নাকি?

—আমি আবার কোথায় যাবো! যাওয়ার চাল্-চুলো কি আছে নাকি?

—তবে?

—উনি যাচ্ছেন; ভাগ্নীকে তার ঠাকুমার কাছে রেখে আসতে।

—এই গরমে এতোটা ট্রেন জার্নি করা! হেমন্তদা কিন্তু বেশ কাহিল হয়ে পড়বেন।

অমরের কথাটা যে নেহাতই কাব্য তাহা নয়। এই দুরন্ত গরমে ঘাঘরী নদীর জলটুকু শুষ্ক হইয়া গেলেও তাহার রূপটুকু সত্যই শুষ্ক হইয়া যায় নাই। গাছ-লতা-পাতা ঘেরা নদীর তীর। বাতাসে যতো ধূলা উড়িয়া লু বহিয়া যায়—গাছের পাতায় ততোই কাঁপন জাগে, অদ্ভুত একটানা একটা শব্দ সমস্ত জায়গাটায় ছড়াইয়া পড়ে। দূরে তাকাইলে মনে হয় সোনালী জমিতে সবুজ পাড় বসানো একটা শাড়ি কে যেন এলোমেলো ভাবে খুলিয়া রাখিয়া পর্বত-অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াছে।

সূর্যের তেজ অনেকখানি কমিয়া আসিয়াছে। রোদ অপেক্ষা এখন ছায়ার আধিপত্যটাই বেশি।

অমর যেমন পারিল, যখন যাহা মনে ধরিল, সেইভাবে দাঁড় করাইয়া পদ্মর ছবি তুলিল। বালুচরে হাঁটিয়া হাঁটিয়া পা ভারী হয়। শেষ পর্যন্ত দুজনাই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। পদ্ম বলে,

—আর পারি নে, পা গেলো। চলুন, ফিরি।

অমর মাথা নাড়ে : —বাড়ি ?

—না ; সবে তো বিকেল পড়লো। আরো খানিকক্ষণ ছায়ায় বসে জিরিয়ে নি। সন্ধ্যে হওয়া পর্যন্ত থাকবো।

—তাই চলুন। তা ছাড়া আপনাদের কোয়ার্টারও বা কি এমন দূরে ? বিশ মিনিটের পথ তো ; গেলেই হবে।

বিকালের ছায়া নামিয়া বালুচর ছায়াময় হইয়া উঠিয়াছে। ওপারে দূর বনান্তরাল শ্রেণীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বটা এতোক্ষণে গভীর কালো রেখার অন্ধকারে মুছিয়া যাইতে বসিয়াছে—ঠিক যেন জলরঙ্ চড়ানো একটি নিসর্গ চিত্র। অস্পষ্ট অথচ ইংগিতপূর্ণ রহস্য ভাণ্ডার। ওপার হইতে বকেরদল বাতাসে বুক ভাসাইয়া দিয়া উড়িয়া আসে।

এপারে তটের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পদ্ম দাঁড়ায়।

—কী সুন্দর ভিজে বালি !

সিক্ত বালুতটে পা ডুবাইয়া পদ্ম একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরে হাঁটু মুড়িয়া বসিয়া পড়ে।

—খুঁড়লে জল উঠবে, জানেন ! : পদ্ম মুখ তোলে।

—নাকি ? না তো, জানিনা।

—ওমা ! আচ্ছা, দেখুন ! : পদ্ম অনেকটা জায়গা জুড়িয়া গোল করিয়া বালি খোঁড়ে। তারপর হাত গুটাইয়া সমান্তরাল ভাবে হাঁটুর উপর রাখে—মুখ গুঁজিয়া একদৃষ্টে গর্তটার দিকে তাকাইয়া থাকে।

অমরও বালির উপর বসিয়া পড়ে।

গর্তটার মধ্যে ধীরে ধীরে জল জমিয়া উঠিতে সুরু করে।

—বা, বেশ তো !

—এখানে অনেকেই এই ভাবে জল বের ক'রে কলসী ভরে, হাত পা ধোয়।

—জলের মধ্যে হাত ডুবাইয়া অমর বলে, খুব ঠাণ্ডা তো। দাঁড়ান, আমিও একটা খুড়ি।

অমর বালি খুড়িতে বসে। পদ্ম দেখে।

—আমারটায় তেমন জল হ'লো না। : জল ছিটাইতে ছিটাইতে অমর কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করে।

—কোথথেকে আর হবে? আপনার প্রাণে কি আর দয়ামায়া আছে? যে ভাবে জল নেই, শুধুই শাঁস—সেই ডাব কুড়ুল দিয়ে কাটলেও যে এক রত্তি জল পাওয়া যায় না, তা জানেন তো! : পদ্ম ইংগিতময় হাসি হাসে।

—তাই নাকি! কি করে জানলেন আমার প্রাণটা পাথর?: অমরও পরিহাস করে।

—দেখলাম তো।

—জল হ'লো না—তাই!

পদ্ম এবার মাথা ঝাঁকাইয়া বলে,

—সত্যি-ই তাই। জানেন না, এদেশের লোকেরা কিন্তু এটা বিশ্বাস করে।

—কি, এই বালি খুঁড়ে জল বের করা?

—হ্যাঁ। বালি খুঁড়লে যার গর্ত যতো জলে ভরবে তার নাকি ততোই মায়া-মমতা। শুনেছি, এ দেশের লোকে নাকি বিয়ের আগে ছেলে মেয়ে দু'জনাকে দিয়েই বালি খোঁড়ায়!

—আজব ব্যাপার! যেমন দেশ তার তেমনি কাণ্ড। : অমর জোরে হাসিতে থাকে, 'শুকনো বালিতে গিয়ে খুঁড়ুক না, দেখি কেমন জল বেরোয়?

—শুকনো বালিতে যাবে কেনো? মানুষ কি শুকনো?

—তো কি ?

—মানুষের প্রাণে মায়া-মমতা, রসকষ থাকবে না ? তবে আর সে মানুষ কিসে ?

—হায়, হায়, বৌদি—তা হ'লে আমি ? আমার কি হবে—! আমি কি অমানুষ, জন্তু ? আমার প্রাণে রস নেই—কষ নেই— ! : অমর অসহায়ের ভঙ্গী করে।

—কথাটা কি খুব মিথ্যে ?

পদ্ম বালির মধ্যে পা ডুবাইয়া দিয়া আনমনে বালির ঘর গড়িতে থাকে।

সমস্ত ব্যাপারটা নেহাতই পরিহাস ভাবিয়া অমর এতোক্ষণ পদ্মর কোনো কথাতেই তেমন মনোযোগ দেয় নাই। অর্থাৎ যতোটা মনোযোগ দিলে একটা কথার নিগূঢ়তম তাৎপর্য বুঝিতে পারা যায়, ততোটা মনোযোগ সে দেয় নাই। পদ্মর শেষ কথাটা তাহার কাণে বাজে। গলার স্বরটাও কাণে পরিহাসের মত শুনাইল না, বরং মনে হইল পদ্মর গলায় বিশেষ একটা ইংগিত আছে। অমর ঘাড় ফিরাইয়া পদ্মকে দেখিতে থাকে। শ্রান্ত, শুষ্ক, থমথমে মুখ। দেখিয়া সহজে কিছু বুঝা যায় না।

এক মুঠা বালি তুলিয়া অমর পদ্মর বালির ঘরের ওপর ছুঁড়িয়া মারে।

—ওকি, ঘর আমার ভেঙ্গে যাবে যে !

—যাক্। বালির ঘর ভেঙ্গেই যায়।

অমরের গলার স্বরটাও হঠাৎ গম্ভীর হইয়া ওঠে। চোখের দৃষ্টি তীব্র—অনুসন্ধানীসুলভ। পদ্মও তাকাইয়াছে। এক লহমা দুজনা দুজনার চোখে চোখ রাখিয়া চুপ করিয়া থাকে।

পদ্ম চোখ নামাইয়া মৃদুস্বরে বলে,

—আমার ঘর ভাঙ্গলে আপনার কি সুখ ?

—দুঃখই বা কিসের !

—তাই হওয়াই স্বাভাবিক।

—না। যে ঘর বরাবরের জন্য নয়, যা টিঁকবেনা জানি, তা থাকলেই বা কি, ভাঙ্গলেই বা কি ? এর জন্যে দুঃখ হবে কেনো ?

—কি জানি, আমার সে রকমই মনে হয়েছিলো। : পদ্ম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আকাশের দিকে তাকায়।

আবার সেই নিস্তব্ধতা। কেহ কোন কথা বলে না। মনে মনে ভাবনার পাখা মেলিয়া দেয়।

অবশেষে পদ্মই উঠিয়া দাঁড়ায়। বলে, চলুন।

অমর তবু ওঠে না। অলস ভঙ্গীতে দূরে চোখ মেলিয়া বসিয়া থাকে, সিগারেটের ধোঁয়ায় মনের জটগুলি আরও কুণ্ডলী পাকায়।

খানিকটা অপেক্ষা করিয়া পদ্ম বলে, হলো কি আপনার ? উঠুন—।

—কি হবে উঠে, বেশ তো বসে আছি।

—তা বই কি ? আপনার না হয় ঘর-সংসার বলে কিছু নেই। তা বলে কি সকলের ? একরাশ কাজ পড়ে আছে না আমার !

—তবে যান। একাই যান আপনি। বেশ লাগছে আমার, আমি এখন উঠছি না। : অত্যন্ত নিস্পৃহ স্বরে কথাটা বলিয়া অমর টান হইয়া বালির উপর শুইয়া পড়ে।

—ওমা, শুলেন যে। উঠুন—: পদ্ম খোঁপাটা ঠিক করিয়া লইতে থাকে।

অমর ওঠে না। আরও একটু অপেক্ষা করিয়া পদ্ম এবার অমরের হাত ধরিয়া টান দেয়। অমর তবু নিশ্চল। শেষ পর্যন্ত টানাটানি। পদ্ম প্রাণপণ শক্তিতে অমরকে টানিয়া উঠাইবার চেষ্টা করে আর অমর কাঠ হইয়া পড়িয়া থাকে। প্রবল আকর্ষণের ফাঁকে পদ্মর হাতের মুঠি

শিথিল হয়। কয়েক পা পিছাইয়া পদ্ম অত্যন্ত বেকায়দায় বালির উপর ছিটকাইয়া পড়ে।

অমর উঠিয়া বসে।

পদ্মও উঠিয়া বসিয়াছে। চুলে, গলায়, মুখে, বালি ঢুকিয়া একাকার। মুখের একপাশ আর কাঁধটা তো বালিতে বালিময়।

পদ্মর অবস্থা দেখিয়া অমর হো হো করিয়া হাসিতে থাকে।

আঁচল দিয়া পদ্ম মুখ মোছে। নিজেও সে হাসে।

—দেখুন তো, কি করলেন? সর্বাংগে বালি কিচকিচ করছে।

—তাই তো, আমি করলুম! আপনি গেলেন গায়ের জোর ফলাতে আর—

—থাক, থাক। এখন একটু জল না পেলে অন্ধ হয়ে যাবো—: পদ্ম চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলে।

—দিন, আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি!

অমর পদ্মর চোখের বালি পরিষ্কার করিতে আগাইয়া আসে।

তবু জল। জল ছাড়া পদ্মর চলিবে না। বালিতো শুধু নয়—পদ্মকে চোখের জল দিয়াই মনের কালি ধুইয়া ফেলিতে হইবে, আর সর্বাংগ ভিজা বালিতে মাখামাখি হইয়া যে অসহনীয় অস্বস্তি তাহাও মুছিয়া না ফেলা পর্যন্ত তাহার স্বস্তি নাই।

একটু আগাইয়া গেলেই জল—একবারে পাড়ের কাছেই। দুজনাই আগাইয়া যায়। পাহাড়ী নদীর ধারা। এইখানটায় আবার কালো কালো অজস্র পাথর আর নুড়ি। কাছেই বটগাছের একটা পত্রপূর্ণশাখা বাঁকা ধনুকের মত জলের উপর নামিয়া আসিয়াছে। একটা অংশ তার জলমগ্ন। সমস্ত জায়গাটা জল, পাথর, ছায়া আর শাখায় অপূর্ব একটা স্নিগ্ধতা দিয়া ভরা।

অমর জুতা খুলিয়া সরাসরি জলে নামে। হাঁটু অবধিও জল নাই। সামান্য একটু স্রোতের টান আছে, এই যা। পরমানন্দে অমর সেই জলই পান করে, মুখ হাত ধোয়।

গাছের আড়ালে আর পাতার ছায়ায় দাঁড়াইয়া পদ্ম সন্তর্পণে তাকায়। এখান হইতে অমরকে দেখা যায় না। নির্জন পত্রকুঞ্জে দাঁড়াইয়া পদ্ম নিজেকে শোভন করিতে বসে। আঁজলা ভরিয়া জল তোলে। মুখ, চোখ, ঘাড় হইতে বালির শেষ অস্তিত্বটুকু পর্যন্ত ধুইয়া ফেলে। বুকে—পিঠে পর্যন্ত বালি ঢুকিয়াছে। পদ্ম বুকের বাস সরায়।

পাথরের উপর চুপচাপ বসিয়া অমর ভাবে: ওই যে শুষ্কপ্রায় নদীর একটি শীর্ণ ধারা নুড়ি ও পাথরের সান্নিধ্যকে আজো ভুলিতে পারে নাই, বটগাছের অবনত শাখাটির যেটুকু নাগালে পাইয়াছে বুকে জড়াইয়া নীরবে সোহাগ জানাইতেছে; ওই যে জলের ছোট ছোট দু'একটি বৃত্ত; কিছু খড়কুটা—সোহাগের ভাগ পাইবার জন্য যাহারা জড় হইয়া আছে—ইহারা সকলেই যেন তাহার মনের বিশেষ চিন্তাটিকেই রূপ দিতেছে। পদ্মর প্রাণপ্রবাহ ঠিক অমনই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—তবু নিঃশেষ হয় নাই—এখনো হেমন্তবাবুর যে অংশটুকু পাওয়া যায় তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই পদ্ম সোহাগ জানায়। তাঁহার সেবা, সংসারের দায়-অদায়—এ সবই তো তাই। আর অমর যেন ওই খড়কুটা—ভাসিয়া আসিয়া সোহাগে ভাগ জুটাইতে বসিয়াছে।

পত্রান্তরাল হইতে পদ্ম বাহির হইয়া আসে।

কালো বড় একটা পাথরের উপর বসিয়া পদ্ম জলে পা ডুবাইয়া দেয়। বলে, কি, বড় চুপচাপ যে।

—চুপ হবার মতনই জায়গা এটা। কথা মানায় না।

—সত্যি, জায়গাটি বড় সুন্দর। : পদ্ম জলের মধ্যে পা নাড়ে আর সেই দিকেই একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে।

নীরবেই কতকটা সময় বহিয়া যায়।

—দেখছেন? : অমর কথা বলে।

পদ্ম তাকায়। অমর পশ্চিম দিগন্তের প্রতি আঙ্গুল দেখাইয়া বলে,

—কী লাল; সূর্যটা কতো বড় দেখাচ্ছে। এই তো দেখছেন, এবার তাকিয়ে থাকুন, দেখতে দেখতে এক্ষুণি ও কোথায় যে হারিয়ে যাবে তার ঠিকানা পাবেন না।

সূর্য অস্ত যায়। আকাশের গায় যে সোনা-গলা রঙ্ লাগিয়াছিল সে রঙও সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে মুছিয়া আসে।

পদ্ম ও অমর ফিরিয়া চলিয়াছে। পাশাপাশি; গা ঘেঁষাঘেষি করিয়া।

—আমি তো নিজের আড্ডায় ফিরে চললাম—শীঘ্রি-ই! : অমর বলে।

—মানে?

—কলকাতায়।

—হঠাৎ?

—তা একটু হঠাৎই। আর বেশি দিন এখানে থাকতে সাহস হয় না।

পদ্ম প্রথমে কিছুই বলে না। মনে মনে কি ভাবে, পরে বলে,

—আপনি যে ভীতু এ কথা কি নতুন করে জানতে হবে?

—ভীতু কি না বলতে পারি না, তবে আমি দুর্বল। এ আমি নিজেই জানি। তাইতো পালিয়ে যেতে চাই। : অমরের গলায় আবেগ।

—পালিয়ে গিয়ে লাভ? তাতে পরিত্রাণ পাবেন? : পদ্মর কণ্ঠস্বরেও কাঁপন জাগে।

—কি জানি! কিন্তু এ ছাড়া তো পথ নেই।

—নেই?

—না।

হাঁটিতে হাঁটিতে ছু-জনাই রেল লাইনের উপর উঠিয়া আসে। স্লিপারে পা ফেলিয়া আগাইয়া চলে। সাইড়িং-এর ক্রশিং, ক্ষুদে হোম সিগনালের আলো। ওই তো বাড়ি; স্টেসন।

পদ্মর হঠাৎ যেন খেয়াল হয় সব ফুরাইয়া আসিয়াছে।

অমরের হাতটা খপ্‌ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া পদ্ম বলে,

—শুনুন, কাল আসবেন? কা-ল। গাড়ি চলে যাবার পর?

—আসবো।

—তবে যান; আজ আর নয়।

পদ্ম যেন জোর করিয়া ঠেলিয়া অমরকে লাইন হইতে নামাইয়া দেয়। তারপর হন হন করিয়া সোজা কোয়ার্টারের দিকে আগাইয়া চলে।

অমর বিমূঢ়, বোবা হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে। কাল? কাল বিকালের গাড়িতেই না হেমন্তবাবু চলিয়া যাইবেন?

ফিরিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াও অবশেষে আবার অমরকে লাইনের উপর উঠিতে হয়। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। পাহাড়ী পথ ভাঙিয়া তাহাকে ফিরিতে হইবে। বাতি চাই—লোক চাই। হেমন্তবাবুর কাছে স্টেসনে যাইতে হইবে। তিনি পোর্টার ও বাতি দিয়া দিবেন। দরকার পড়িলেই দেন।

অমর স্টেসনের উদ্দেশে পা বাড়ায়।

পদ্ম দ্রুত পদক্ষেপে সোজা গিয়া কোয়ার্টারের পাঁচিলের আড়ালে অদৃশ্য হইল।

অমর ভাবে, কই পদ্ম একবারও তো ফিরিয়া তাকাইল না!

গেটের কাছে আসিয়া বনলতা কিন্তু ফিরিয়া তাকায়।

ঊর্ধ্বশ্বাসে অনেকটা পথ সে অতিক্রম করিয়াছে। মুখে চোখে কেমন একটা ভয়ের ভাব। পিছন ফিরিয়া তাকাইতেই একটু দূরে গাছপালার আড়াল হইতে যে লোকটিকে বাহির হইয়া আসিতে দেখা যায় বনলতা তাহাকে দেখিবার আশা করে নাই। অলস মন্থর পদক্ষেপে সূর্যশংকর আগাইয়া আসিতেছে।

সূর্যশংকর গেটের কাছে আসিলে বনলতা প্রশ্ন করে,

—তুমি কি সোজা-পথ ধরে আসছো?

—হ্যাঁ। চেনো?

বনলতা এবার আরও অবাক মানে। আঁচল দিয়া আলতো ভাবে মুখের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলে,

—আমিও তো এই পথে এলুম।

— আমারও সেই রকম মনে হ'লো।

কথা বলিতে বলিতে উভয়ে বারান্দায় উঠিয়া আসে। ঢাকা বারান্দা হইতে বেতের চেয়ার টানিয়া লইবার সময় সূর্যশংকর বাহাদুরকে ডাকে। বনলতাও খোলা চাতালটায় একটা চেয়ার টানিয়া লইয়াছে।

—দেখো তো কি কাণ্ড! আমি ভয় পেয়ে পড়িমড়ি করি ছুটছি—

—দেখলাম তাই। কি হয়েছিলো তোমার?

— কি আবার! বেড়াতে বেড়াতে আনমনে কখন যে সেই পাথর ভর্তি বাঁকটার কাছে এগিয়ে এসেছি জানিই না। হঠাৎ কিসের যেন শব্দ শুনে হুঁস হলো। দেখি কেউ কোথাও নেই; বিকেলও প্রায় শেষ হয় হয়। কেমন যেন ভীষণ ভয় হ'লো।

—আমি তো তখন—

—শোনোই না: বনলতা বাধা দিয়া বলিয়া চলে, চারপাশে তাকাচ্ছি, দেখি কি, পাথরের আড়াল থেকে একটা লোক উঁকি মারছে।

তাই না দেখে মুখ শুকিয়ে গেলো। এমন ভয় আর জীবনে পাই নি। এক মুহূর্ত আর না দাঁড়িয়ে সোজা ছুটছি—: বনলতা কথার শেষে মৃদু হাসে।

—ভয় পাবার কি ছিলো?

—ছিলো না। ওমা, কি যে বলো, তুমি। একে পাহাড়ী জায়গা; বিদেশ-বিভুঁই, তারওপর নির্জন, নিস্তব্ধ; বিকেলও নেই—এত্তোটা পথ এগিয়ে এসেছি একা। : বনলতা আলতো ভাবে আবার শাড়ির আঁচলে ঘাড় মুখ মোছে। যেন সমস্ত ভয়টুকু এতোক্ষণে সম্পূর্ণ ভাবে সে মুছিয়া লয়।

—পাথরের আড়ালে আমিই ছিলুম।

—তুমি? : বনলতা প্রশ্নসূচক চোখে সূর্যশংকরের দিকে তাকায়।

—বলো কেন, সে আর এক কাণ্ড! দিব্যি সাইকেল চালিয়ে ফিরছি—একটু বোধ হয় বেহুঁস ছিলাম। পাথরের বাঁকের কাছে এসে সাইকেলটা পাথরে লেগে স্লিপ্ করে গেলো। টাল খেতে খেতে ঢালে গড়িয়ে পড়লুম। উঠে দেখি, সাইকেলের হ্যাণ্ডেল গেছে বেঁকে, টায়ার ফেটেছে। ভাবছি, কি করি, কাউকে দেখতে পেলে সাইকেলটা তার হাতে গছিয়ে দেওয়া যায় কিনা—তখনই বোধ হয় আমায় তুমি দেখেছো!

—কি আশ্চর্য, আমায় ডাকবে তো তুমি? : বনলতা তেমনি অবাক সুরেই বলে।

—কি করে ডাকবো। আমি তো ঢালের নীচে, পাথরের আড়ালে—সাইকেল নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি। তখনও তোমায় দেখি নি। ওপরে উঠে এসে যখন তোমায় দেখলুম তখন তো প্রাণ বাঁচাবার জন্যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে তুমি ছুটছো। তবু তোমার সংগী হবার আশায় জোর কদমে হেঁটেছি অনেকটা।

—খুব করেছো। তুমি আসছো সংগী হবার জন্তে আর আমি ভাবছি কেউ আমার পিছু নিয়েছে। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটছি—। : বনলতা যেন নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য অনুতাপ জানায়। বলে, 'দোষটা তোমারই।'

সূর্যশংকর হাসে। বলে,

—কেন? তোমারও তো হ'তে পারে। যার ভয়ে তুমি ছুটে পালাচ্ছো তাকে অন্ততঃ একবার দেখবে তো। একবারও পিছন ফিরে তাকালে না– সামনের দিকেই শুধু ছুটে চল্‌লে।

—আমার দোষ কি! আমি তো আগেই ভয় পেয়েছি! তুমি যখন চিন্‌লে তখন তোমারই ডাকা উচিত ছিলো।

—না, আমরা তখনও দূরে দূরে। ডাকলে চিনতে পারতে না; আরও ভয় পেতে।

—উহুঁ—কখনোই না। : বনলতা দৃঢ় আপত্তি জানায়।

—মুখে 'না' বললেই কি না হয়। আমি ডাকলেও তখন কে ডাকছে, কেন ডাকছে এতো ভাববার মত মন তোমার হ'তো না।

—ডেকেই না হয় সেটা পরখ ক'রতে।

– পরখ কি আর না ক'রেছি। জানি বলেই তো বলছি। মনগড়া যে ভয় সে ভয় মনকে মিথ্যে আশংকা দিয়েই ভরে রাখে, ভাববার কথা তখন মনে থাকে না।

সূর্যশংকরের মুখে অনেকক্ষণ হইতেই অর্থবহ হাসির কয়েকটা রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শেষের কথাগুলি যখন বলে তখন সেই রেখাগুলি আরও স্পষ্ট, আরও অনাবৃত হয়। বনলতা যে সূর্যশংকরের তাৎপর্যপূর্ণ এই কথাগুলির অর্থ সবটাই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে—তাহার মুখ দেখিয়া তাহা মনে হয় না। তবে, সূর্যশংকর যে বিশেষ একটা

বক্তব্য এই কথাগুলির মাধ্যমে, ইংগিতে প্রকাশ করিতে চায় বনলতা তাহা বুঝিতে পারে। মুখে সে কিছুই বলে না। মনে মনে ভাবে।

সাহেবের ডাক বাহাদুর অনেকক্ষণই শুনিতে পাইয়াছিল।

চা ও বৈকালিক জলখাবারের প্লেট গুছাইয়া লইয়া বাহাদুর এবার হাজির হয়। সাদা ধবধবে টেবল-ক্লথ পাতা গোল বেতের টেবিল সামনে রাখিয়া বাহাদুর চায়ের পাত্র সাজাইয়া দেয়। সূর্যশংকর বলে,

—এতো কি দিলি রে? আমি একটু পরেই জঙ্গল যাবো। রাতের খাওয়া খেয়েই বেরুবো। জিনিসপত্র সাজিয়ে দিবি। বেশি দেরি করিস না।

বাহাদুর যে বাংলা বুঝিতে না পারে এমন নয়। সাহেবের কাছে বহুকাল ধরিয়া আছে। বুঝিতে সে অনেক কিছুই পারে কিন্তু দুইচারিটি কথা ছাড়া বেচারী আর কিছুই বলিতে পারে না। বাংলা ভাষার শব্দ সম্পদকে নিজের জিহ্বার মধ্যে আয়ত্ত করিতে গিয়া প্রায়ই সে ফ্যাসাদ বাঁধায়। আজও বাহাদুর সাহেবের সামনে বাংলা বলিবার লোভ সামলাইতে পারে না। বিশেষ করিয়া বনলতাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হইলে বাহাদুরকে যেন এখন বাংলা বলিতেই হইবে। বনলতার পানে অঙ্গুলি সংকেত করিয়া বাহাদুর সাহেবকে বলে,

—মায়জী আপনা হাতে দুখানা হোয়েছে সাব, আওর ম্যায় তো এক। তিনোঠোই আচ্ছা খানা—

বাহাদুরের কথা শেষ হয় না—সূর্যশংকর সজোরে হাসিয়া ওঠে। বাহাদুর ভ্যাবাচাকা খাইয়া চুপ করিয়া যায়।

—মাজী আপনা হাতে দু'খানা হ'য়েছে কিরে! এ্যাঁ, সর্বনাশ! মাজী তো সামনেই বসে। বেটা, গর্দভ। বল্, নিজের হাতে দুরকম খাবার তৈরি করেছে। সূর্যশংকর হাসিতে থাকে। বাহাদুর বেজায়

লজ্জা পাইয়া অপ্রস্তুত করুণ-মুখে পালাইয়া যায়। হাসি থামাইয়া সূর্যশংকর বনলতাকে বলে, 'বেটা পালালো। তোমায় কমপ্লিমেণ্ট দেবার এতো লজ্জা আগে জানলে ও নিশ্চয় তোমার হাতে-তৈরি খাবারগুলো বয়ে নিয়ে আসতো না। অবশ্য গর্ব করা উচিত নয় আমারও। আমিও একেবারে বেয়াদপ হিন্দী বলি।

– তুমি যেন কী। কেন বাপু ওকে অমন ক'রলে? ঠিকই তো বলেছে। : বনলতা কাপে চা ঢালিতে থাকে।

প্লেট হইতে মাংসের সিঙ্গাড়াটা মুখে পুরিয়া সূর্যশংকর বলে,

—কোনটা ঠিক, ওর মনের বক্তব্য না মুখের ব্যাকরণ।

—তুই-ই। সত্যিই তো মাঝী নিজেকে ছু'খানা করেছে।

বনলতা তাহার প্লেট হইতে একটু সুজি তুলিয়া মুখে দেয়।

—বুঝলাম না।

—খুব কঠিন তো নয় কথাটা তবু না বুঝবে কেন?

সূর্যশংকর আরও একটা সিঙ্গাড়া মুখে দেয়। একদৃষ্টে বনলতার দিকে খানিকটা তাকায় তারপর সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করে। গোধূলির আভায় সামনের লতাকুঞ্জে হাল্কা সোনার রঙ ধরিয়াছে। কৃষ্ণচূড়ার গাছটি লালে লাল। এক জোড়া চন্দনা আসিয়া শাখায় বসিয়াছে। কোথা হইতে ইহারা উড়িয়া আসিয়াছে কে জানে। পাশাপাশি বসিয়া ঠোঁট ঠোকাঠুকি করে, পাখা ঠোকরায়, ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘন হয়; আবার একে অপরের কাছ হইতে সরিয়া যায়।

বনলতা চায়ের কাপে ঠোঁট ঠেকাইয়া অনেকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস যখন বুক ঠেলিয়া বাতাসে মিশিয়া যায় তখন বনলতার চমক ভাঙ্গে। দেখে, সূর্যশংকর একদৃষ্টে তাহার পানে তাকাইয়া রহিয়াছে। সে দৃষ্টি উদাসী নিরপেক্ষ কোনো এক দর্শকের দৃষ্টি নয়—

তাহারও অপেক্ষা কিছু বেশি। একটা মানুষ যেন অন্তর্দৃষ্টি দিয়া কাহারো অন্তর উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিতেছে।

—অযথা চেষ্টা। বনলতা মনে মনে ভাবে। বিষণ্ণ হাসি হাসে, বলে, 'অমন করে দেখলেই কি সব জানা যায়?

– তা যায় না জানি। কিন্তু জানলেই ভালো।

– কেন?

—আগ্রহ মেটে কিম্বা কৌতূহল!

—ও দু'টোর কোনোটাই নয় বোধ হয়। বরং বলো অযথাই।

—অযথা কিছু জানতে চায় না মানুষে। অন্ততঃ আমি নই। সূর্যশংকর চায়ের পাত্র নিঃশেষ করিয়া সিগারেট ধরায়। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলে, নিজেকে তুমি দু'খানা ক'রলে কেনো? তার দায় আমার নয় কিন্তু তবু আমায় তুমি দায়ী ক'রছো।

—তোমায় দায়ী করবো কেন? বনলতা আরও বিষণ্ণতর হয়। বলে, 'এ আমার দোষ। আমার ভাগ্য। তুমি তো সেই কবেই চলে এসেছিলে। চাও না বলেই না। তবু আমি সহজ কথাটা বুঝলাম না; মনের মত ক'রে সাজিয়ে গুজিয়ে শুধু ভাবলাম—অর্থহীন আকাশকুসুম ভাবনা। অভিমান করলাম, কাঁদলাম। এতোদিন ধ'রে তোমার কথাটাই বুঝি নি, এখানে এসে, তোমার কাছে থেকে, তোমায় দেখে ধীরে ধীরে যেন সবই বুঝতে পারছি এতোদিনে।

—ঠিক বুঝছো তো?

—না, সে গর্ব ক'রবো না।: বনলতা কৃষ্ণ-সন্ধ্যার অন্ধকারে নিজের সবটুকু ব্যক্তিত্বের মর্যাদাকে ডুবাইয়া দিয়া বলে, আর এ টানা-পোড়েন ভালো লাগে না। তোমার বিষয়ে সম্পূর্ণ নিভুল হ'তে পারলে স্বস্তি পেতাম। মনে হয় তোমার মনের কথা আমি

বুঝি নি। অকপটে যদি ব্যক্ত করতে তোমার মন, আমার পরম লাভ হ'তো।

—তা কি করিনি?

—না; কোনদিনই নয়। আমার সম্পর্কে বিরাগ, বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছো কিন্তু কোনদিন সোজাসুজি তোমার মনের কথা প্রকাশ করো নি।

—না কি? তা বেশ, কি জানতে চাও ব'লো? : সূর্যশংকর চেয়ারটা একটু সরাইয়া লইয়া পা টান করিয়া বসে।

বনলতা নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইতে একটু সময় লয়। মনে মনে স্থির করে, অনেকদিনের বহু অনিশ্চিত চিন্তা, বহু প্রত্যাশার প্রকৃত স্বরূপ আজ সে সরল, সহজ, যথার্থ ভাবেই জানিয়া লইবে। এ অন্তর্দ্বন্দ্বে লাভ কি? মিথ্যা মায়াডোরে মনকে অহেতুক বাঁধিয়া রাখিয়া যতটুকু সান্ত্বনা জোটে তাহার অপেক্ষা যে ঢের বেশি জোটে দুঃখ। আর কেনোই বা এ খেলা? জীবন লইয়া খেলা করার মধ্যে বাস্তবিক কোন গৌরব নাই, শান্তি তো নয়ই। বনলতা এতোদিন এই খেলাই খেলিয়াছে। আর নয়। সবই যখন গিয়াছে, শেষ সম্বলটুকুও যাক। সম্বলই বা বলি কেন? সত্যই তো তুমি আমায় ভালোবাসো না; ভালোবাসিতে চাও না। আমিই কেবল ভিখারীর মত দাও দাও করি। তোমার ওপর আমার অধিকারটা যেমন একতরফা, প্রার্থনাটাও তেমনি এক পক্ষের। জানি তোমার প্রত্যাখান আমার পক্ষে চরম দুঃখের, পরম লজ্জার। কিন্তু তবু মনে মনে এতোকাল বিশ্বাস করিয়াছি, তুমি আমায় ভালোবাসো। এ শুধু বিশ্বাস নয়, সূর্য—এ যে আমার কতো বড় গৌরব, কী মহার্ঘ স্বপ্ন কেমন করিয়া সে কথা তোমায় বোঝাই? ভালোবাসা যে পায় তার সুখ, শান্তি, গৌরব সবই তো নিজের রূপ আর মনের বিত্তের মূল্য

নিরূপণ; তুমি আমায় লক্ষ জনের ভিড়ে স্বতন্ত্র করো, আসন দাও— তোমার চোখে সামান্য আমি অসামান্য হইয়া উঠি; তোমার এই স্বীকৃতিই আমার আমিকে সার্থক করে। তাই। অথচ সেই তুমি যদি প্রত্যাখান করো, কি আমার থাকে? আমি সাধারণ হইয়া যাই। মনে হয় না বিধাতা আমায় পাঁচজনের প্রবাহ হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছেন, রূপে-গুণে ভূষিত করিয়াছেন; ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য করিয়াছেন। করিলে আমিও কি ধূলায় পড়িয়া থাকিতাম। সূর্য, তাই এতোদিন তোমার এতো অবহেলা সত্ত্বেও নিজেকে সর্বদিক দিয়া নিঃস্ব ভাবিতে পারি নাই। আশা করিয়াছি, স্বপ্ন দেখিয়াছি। মানুষ মরিতে বসিয়াও যেমন জীবনের আশা করে তেমনি।

কিন্তু ভালোবাসা তো ভিক্ষা নয়, অবহেলা আর অবজ্ঞা নয়। শুধু এক পক্ষের আত্মসমর্পণ নয়। তাই এ বোঝাপড়া—এই প্রশ্ন।

—যা জানতে চাইবো আজ অকপটে সব বলবে, বলো? : বনলতা মৃদু, কাঁপাস্বরেই জানিতে চায়।

—সজ্ঞানতঃ যতোটা অকপটে বলা সম্ভব অবশ্যই বলবো।

—আমার সম্পর্কে তোমার মনোভাব কি?

—পরিচিত আর পাঁচ জনের মত নয়; তার চেয়ে স্বতন্ত্র। অন্তরংগ জনের মত।

– আমার ভালো-মন্দের কথা ভাবো?

—ভাবি।

—ভাবোই যদি তবে এ অবস্থায় আমার সংগে এমন ব্যবহার করছো কেন? কি আছে আমার, কে আছে? কোথায় যাবো? আপদে বিপদে কে পাশে এসে দাঁড়াবে, কাকে পাবো বলতে পারো? আর আমার ভালো-মন্দ বলতে এই সবই তো বুঝোয়। তাই কি না, বলো—?

বনলতা মনের আবেগ বহুকষ্টে কিছুটা সম্বরণ করিয়া কথাগুলি শেষ করে।

সূর্যশংকর মনোযোগ সহকারে কথাগুলি শোনে, চিন্তিত মনেই মাথা নাড়ে। বলে, তাই।

—তবে? তা হ'লে বলো, আমার ভালোর জন্যে কি তুমি ক'রলে?

—যা আমি ক'রতে পারি, আমার পক্ষে সম্ভব।

—আশ্রয় না দেওয়া, গ্রহণ না করা—শুধু এই বুঝি তোমার পক্ষে সম্ভব?

—তা-হ্যাঁ, তাই। এ ক্ষেত্রে আর কি সম্ভব হতে পারে।: সূর্যশংকর আবার একটা সিগারেট ধরায়। অন্ধকারে তাহার মুখ প্রায় দেখাই যায় না—শুধু সিগারেটের লাল স্ফুলিংগটাই চোখে পড়ে। একটু নীরব থাকিয়া সূর্যশংকর বলে, 'অকপটে আরও কটা কথা বলি, শোনো। তোমার কি আছে, কে আছে, কোথায় যাবে, পাশে কাকে পাবে—এ সমস্ত কথার তু' রকম উত্তর আছে। যদি সংসারী লোকের মত গায়ের কাদা গায়ে মেখে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে থাকতে পারো তা হ'লে নিজের সংসারেই ফিরে যাও। তা যদি না পারো স্বতন্ত্র জীবিকা সংগ্রহ করো; রচনা করো নিজস্ব জীবন মনোমত করে। আমি তোমায় জীবিকা সংস্থানের ব্যাপারে সামান্য কিছু সাহায্য ক'রতে পারি।

—জীবিকাই যেন জীবনে শান্তি—

—না না; তা বলিনি। পরমুখাপেক্ষী জীবনে তোমার মনের গ্লানি যদি বাড়ে তাই বলছি। জীবনে শান্তি পাওয়া যে কি তা আমি জানি না। ওটা মানুষের একেবারেই ব্যক্তিগত সমস্যা।

খানিক দূরে একটা বাতি দেখা যায়; লণ্ঠনের আলো। অন্ধকারের মধ্যে তালে তালে তুলিতেছে।

সূর্যশংকর ও বনলতা উভয়েই সেই আলোর পানে তাকাইয়া থাকে। আলোকধারী যে কাহারা বনলতা বুঝিতে পারে। অমর আর স্টেসনের কোন কুলী নিশ্চয়। আজকাল রোজই এই ভাবে অমর রাতে বাসায় ফেরে। সেদিন তো রাতে ফেরেই নেই। আর কিছুক্ষণ পরেই, অমরের আবির্ভাবে, বনলতার একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যাটা যেন আলোর আভায় স্পষ্ট হইয়া তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া উঠিবে। সে যেন আরও অসহ্য। কি যেন তবু বাকি থাকিয়া যায়। কিসের একটা প্রশ্ন, শূন্যতা। আর বুঝি সময় হইবে না, সুযোগ জুটিবে না। বনলতা কেমন যেন অজ্ঞান-আবেগের বশবর্তী হইয়া প্রশ্ন করিয়া বসে,

—আমরণ একা থাকবো? পাশে কেউ থাকবে না, কাউকে পাবো না?

সূর্যশংকর বনলতার অসহায়তার তীব্রতাটা বুঝি অনুভব করিতে পারে। বলে,

—তেমন ভাবে দেখতে গেলে পৃথিবীতে সবাই একা। পাশে কাউকে পেতে চেয়ো না, পাশে কাউকে পাওয়া যায় না। হয় অন্ধের মত আগের লোকের লাঠি ধরতে হয়, না হয় পিছনের লোকের হাত। একেই বলে সংগতি। সভ্য মানুষের জীবনের সবটাই সংগতি। এই সংগতিকেই বলে সংসার। যদি সংসার রচনা ক'রতে চাও—হাত ধরার মানুষ কি আর পাবে না? সুলভ বস্তু সেটা। আর হ্যাঁ—আপদবিপদের কথা বলছিলে না? আমার কি বিশ্বাস জানো, ও সবই অজ্ঞাত ভবিষ্যতের মত। তুমি জানো না কি হবে, কি হতে পারে! তাই বিপদকে জয় করার মত মন তৈরি করা ছাড়া আর তুমি কি ক'রতে পারো? তুমি সে যোগ্যতা অর্জন করো।

—তুমি? তুমি কি কিছুতেই সংসার রচনা ক'রতে পারো না?:

অসহ্য আকুতি, বিহ্বল বেদনায় বনলতা যেন শেষবারের মত শ্‌
করে।

—না, আমি তোমাদের সংগে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবো না; মনকে রাশ বেঁধে রাখা আমার কর্ম নয়।

বনলতা আর কোনো কথা বলে না। অন্ধকারেই সূর্যশংকরের মুখ হইতে দৃষ্টিটা অপসারিত করিয়া আকাশের পানে তাকায়। কালো একটা মেঘ দ্রুতগতিতে তারাগুলিকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে।

গেট হইতে পোটারকে বিদায় দিয়া অমর বারান্দায় উঠিয়া আসে।

—কোথায় গিয়েছিলে? : সূর্যশংকর প্রশ্ন করে।

—স্টেসন।

—ওখানে বুঝি খুব আড্ডা জমিয়েছো?

সহজ সরল প্রশ্ন, তবু অমরের বুকটা হঠাৎ ধক্ করিয়া ওঠে। অন্ধকারে অমরের মুখ দেখা সম্ভব নয়, নতুবা চোখে পড়িত সূর্যশংকরের সরল প্রশ্নেই অমরের মুখটা হঠাৎ বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

—না; এই একটু বেড়িয়ে টেড়িয়ে আসি। : অমর তাড়াতাড়ি বলে। হয়তো কথা ঘুরাইবার জন্যই বনলতাকে সম্বোধন করিয়া আবার বলে, 'বড় তেষ্টা পেয়েছে। এক গ্লাস জল খাওয়াও তো, বনোদি।

বনলতা উঠিয়া যায়। অমর বনলতার শূন্য চেয়ারে বসিয়া পড়ে।

—জঙ্গল যাবে নাকি? : সূর্যশংকর প্রশ্ন করে।

—কবে?

—আজই, এখুনি।

—এই রাত্রে?

—হ্যাঁ। যাবে তো চলো। তুমি তো একদিন রাত্রে জঙ্গলের রূপ দেখতে চেয়েছিলে।

—বেশ, চলো।

বনলতা জল লইয়া ফিরিয়া আসে। এক চুমুকে জলের গ্লাসটা নিঃশেষ করিয়া অমর পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। বনলতাকে বলে,

—তুমিও চলো না, বনোদি? জঙ্গল বেড়িয়ে আসবে। রাতের অরণ্য; অদ্ভুত!

—তুমিও যাচ্ছো নাকি? : বনলতা অমরকে পাল্টা প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, যাই। বহুদিনের সাধ আমার। যাবে, চলো না?

—যাও, তোমরা যাও। আমার সাধ নেই। : বনলতা এবার সূর্যশংকরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলে, 'কবে ফিরবে?'

—ভোর রাতেই।

দোনলা বন্দুক, কার্টিজ, বেতের বাস্কেটে তোয়ালে জড়ানো দু'বোতল মদ, এক কুঁজা জল, সামান্য কিছু খাবার জিপ গাড়িতে তুলিয়া দিয়া বাহাদুর সূর্যশংকরকে জানায়, সমস্ত প্রস্তুত।

ছ'সেলের টর্চটা তুলিয়া লইয়া সূর্যশংকর ঘরের বাহিরে আসে। পাশে অমর। উভয়ে অরণ্য-বিহারের জন্য প্রস্তুত হইয়াই অপেক্ষা করিতেছিল।

বনলতাও বারান্দায় আসে।

সূর্যশংকর হাতের পাইপে আগুন ধরাইয়া অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে আকাশের দিকে লক্ষ্য করিতে করিতে বলে,

—এটা কৃষ্ণপক্ষ না? কোন তিথি?

—হ্যাঁ; আজ ত্রয়োদশী।

ত্রয়োদশীর কথাটা বলিতে গিয়া বনলতাকে মনে মনে যে হিসাবটা করিতে হইয়াছে তাহাতে একাদশী তিথির কথাটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক।

আর শুধু মনেই নয়, এই মুহূর্তে যদি এই তিথিটা বিষাক্ত একটা তীরের মত তাহার মনের মধ্যে বিঁধিয়া যায়, তাহাতেও অবাক হইবার কিছু নাই।

সূর্যশংকর আর সুকুমার—প্রেম আর বিবাহ, হৃদয় বিহ্বলতা আর বৈধব্য নিষ্ঠা। সেই দ্বন্দ্ব!

না, আর দ্বন্দ্ব নয়। ওই অদ্ভুত লোকটার মুখে কিছুদিন হইতে অন্য রঙের ছায়া পড়িতে দেখিয়া বনলতা ভাবিয়াছিল মানুষটার মতিগতির অল্প বিস্তর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কিছু না হোক, স্নেহভাজনের মৃত্যুর নির্মমতা, ভাগ্যের পরিহাস সূর্যশংকরকে অন্ততঃ জীবন সম্পর্কে নূতন করিয়া ভাবিতে শিখাইবে। বৈরাগ্য ও বঞ্চনা অপেক্ষা স্থিতি যে অনেক মূল্যবান ও মধুর—সূর্যশংকর নিশ্চয় তাহা বুঝিতে পারিবে। কিন্তু কই? বনলতা যাহা ভাবিয়াছিল সব ভুল, একেবারেই ভুল।

নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারকে আলোয় ও তীব্র যান্ত্রিক গর্জনে বিক্ষুব্ধ করিয়া জিপগাড়িটা গেট হইতে বাহির হইয়া যায়।

বনলতা সেই দিকেই চোখ মেলিয়া তাকাইয়া থাকে।

ঝড়ের পালা শেষ হইয়া একদিন বর্ষা নামে।

দহন দাহন শেষ হইয়া এবার বর্ষণ। দীর্ঘ দিন ধরিয়া আকাশটা সূর্যতপ্ত তামাটে হইয়াছিল। রোষ-কষায়িত নয়নে ক্ষুদ্র জনপদটির জীবন যাত্রা লক্ষ্য করিয়াছে, দুঃসহ তাপ-বিস্তারে অন্তর্জ্বালার কিছুটা উপশমও করিয়াছে, আবার অসহ্য হইলে ভ্রূকুটি হানিয়া প্রলয়ও বাধাইয়াছে।

শেষ পর্যন্ত ক্ষোভ, উষ্মা, উত্তাপ সবই যেন ধীরে ধীরে নিজের সত্বাতেই বিলীন হইয়া আসে। পর্বতমালার শীর্ষে শীর্ষে বাধা পাইয়া নিরন্তর মেঘ জমিতে থাকে, আকাশ রঙ বদলায়। কাজল-কালো মেঘের সমারোহ আর বিদ্যুত-উৎসব। আকাশ বাতাস গুরু-গম্ভীর মেঘস্বরে প্রতিধ্বনিত, প্রকম্পিত।

ক্লান্তিহীন বর্ষণের মধ্য দিয়া আর এক ঋতুর আবির্ভাব হয়। স্বভাবে এ ঋতু পৃথক ; সম্পদে স্বতন্ত্র।

বুঝি মানুষও এমনি। অন্ততঃ যাহাদের লইয়া এই কাহিনী সেই মানুষগুলির মনের আকাশেও কেমন করিয়াই না রঙ বদল হইতে থাকে! একদিন যাহারা শুধু নিজস্ব জগতটুকু লইয়া পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছিল আজ তাহারা যেন আর সে জগতে নাই। ওই আকাশের মতই সম্পদে, স্বভাবে ইহারা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

তাই কুসুম যখন শোনে ঘরছাড়া সুধাকর সত্যসত্যই মতিলালের সোনার আংটি চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে; দুই বন্ধুতে ভীষণ রকম একটা মারপিট হওয়ার পর সুধাকর শয্যাশায়ী তখন তাহার মনটা অসম্ভব খারাপ হইয়া যায়।

—পরের আংটি বেচে সোহাগীর খরচা যুগোতে যায়। শুনে অবধি ঘেন্নায় মরি। বলিস কি গো, বোস্টমের ছেলে ; অমন বাপ্ যার, তোর মত বউ যার—তার এই কীর্তি। : দামিনী পানের